মির্জ্জা ফর্গাণা [বর্ত্তমান সময়ে ফর্গাণা বা খোকন্দ রুশিয়া রাজ্যভুক্ত] রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বাবরের জননী চেঙ্গিস্-খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য বাবর মুঘল বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত রাজ্য মুঘল রাজত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বাবরের পিতা ওমর শেখ রাজ্যলোভী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল রাজ্যবিস্তার করা। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের জন্ম হয় এবং ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। এসময়ে ফরগণা রাজ্যের রাজধানী আখ্‌শি নামক একটা দুর্ভেদ্য দুর্গবেষ্টিত নগরে অবস্থিত ছিল। বাবরের পিতা ওমরশেখ বেশ গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। এদিকে তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতে, গল্প-কৌতুকে সঙ্গিগণের মনোরঞ্জন করিতে ও শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিতেন এবং খুব পাশা খেলিতেন। অতিরিক্ত সুরাপানের দরুণ, সময় সময় হট্‌কারিতার পরিচয় দিলেও তিনি সদাশয় এবং নির্লোভ ব্যক্তি ছিলেন, অর্থের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। একবার তুর্কীস্থানের উজবেগ্‌দের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই

যুদ্ধে উক্ত বেগেরা পরাজিত হইল এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমুদয়ই বাবরের হস্তগত হইল, কিন্তু তিনি উহার এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া প্রকৃত অধিকারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বিলাইয়া দিলেন—এমনি ছিল তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে নির্লোভ ব্যবহার। বাবর তাঁহার জীবনে বোধ হয় পিতার আদর্শেই এইরূপ নির্লোভ হইতে পারিয়াছিলেন। পিতার মহাপ্রাণতা ও উদারতা যেমন বাবরের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল, তেমনি মাতার গুণাবলী ও প্রতিভা বাবরের চরিত্র-মধ্যে সম্যক্ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাবরের মাতা প্রতিভাশালিনী বিদুষী মহিলা ছিলেন: তিনি তুর্কী ও পারস্যভাষায় অভিজ্ঞা ছিলেন, গৃহস্থালী কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে তিনি অতি সুন্দর কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। পিতা ও মাতা দুই জনেই প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া বাবরও সুপণ্ডিত এবং খ্যাতিমান্ ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন। বাবরের মাতামহী ইসানদৌলত বেগম সে যুগের নারী-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন।

বাবরের পিতা ও মাতার পরিচয়

বাবর পিতার মৃত্যুর পর ফরগণার রাজা হইলেন।

তুর্কীস্থানের অন্তঃর্গত সির নদের তীরবর্ত্তী এই ফরগণা রাজ্যটি অতি সুন্দর ছিল। বাবর ফরগণা রাজ্যের রাজধানী আন্দিজান্ (Andijan) সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'সহরটি অতি সুন্দর। চারিদিকে নীল পর্ব্বত শ্রেণী বেষ্টিত। কোথাও বা সাদা বরফে ঢাকা চূড়াগুলি সূর্য্যালোকে গলিত সুবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এদেশের ভূমি উর্ব্বর ও শস্য শ্যামল এবং ফুলে ফলে অপূর্ব্ব শোভামণ্ডিত। এদেশের ফল যেমন আকারে বৃহৎ তেমনি সুমিষ্ট। আর এদেশের বনে বনে শিকারের অভাব নাই।' এইরূপ সুন্দর দেশের অধিবাসী হইয়া

বাবরের বাল্যজীবন
—সাহস ও বীরত্ব

বাবর অতি শৈশব হইতেই মৃগয়া-প্রিয় এবং অস্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি এতদূর কষ্ট-সহিষ্ণু ছিলেন যে শীতের দেশের বরফমণ্ডিত নদীর অতি শীতল জলের মধ্যেও সাঁতার দিয়া উত্তীর্ণ হইতেন। কখনও শিকার করিতে বাহির হইলে কিংবা কোথাও ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে তাঁহার সম্মুখে যে সকল নদী পড়িত তাহা তিনি সাঁতরাইয়া পার হইতেন।

ফরগণা রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি উহার সব পথঘাট চিনিতেন। একবার মৃগয়া করিতে বাহির হইয়া তাঁহার দলের সকলে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। শিকারের উন্মাদনায় কাহারও লক্ষ্য ছিল না যে তাঁহারা কোন্‌দিকে অগ্রসর হইতেছেন। একে শীতকাল তাহাতে আবার ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, ভীষণ বেগে ঝড়ের মতন হাওয়া বহিতেছে। সঙ্গীরা কেহই কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছেন নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না, সকলেই অপরিচিত প্রান্তরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে বলিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিপদ সময়ে বাবর নিজে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সকলের আগে অশ্বারোহণ করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহার পথ নির্দ্দেশ করিতে এতটুকু ভুল হয় নাই। কেননা ঐ পথে তিনি পূর্ব্বেও অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। বাবরের আর একটা গুণ ছিল তাঁহার স্বগণপ্রিয়তা। স্বীয়বংশের যে কোন ব্যক্তি শত দোষে দোষী হইলেও তাঁহাকে তিনি মার্জ্জনার চক্ষে দেখিতেন।

রাজা হইবার অব্যবহিত পরেই শত্রু কর্ত্তৃক

আক্রান্ত হইয়া বাবরকে একে একে খোজইন্দ্, মার্গিনান্ এবং অপর একটী নগরীর অধিকারচ্যুত হইতে হইয়াছিল। দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণের সহিত কলহ ও বিবাদে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তৎপর অল্প সময়ের জন্য তিনি একটু শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মধ্য-এসিয়ার সমরখন্দ তিনি জয় করেন। সমরখন্দ বিজয়ের (নবেম্বর ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) পর তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে লুঠতরাজ করিতে না দেওয়ায় তাহারা অনেকেই বাবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সমরখন্দ জয়ের উল্লাস প্রশমিত না হইতেই সংবাদ আসিল যে উজবেগেরা ফরগণা আক্রমণ করিয়াছে, কাজেই তাঁহাকে ফরগণার দিকে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু তিনি ফরগণা রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজধানী আন্দিজান্ রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহাকে ফরগণাও হারাইতে হইল। বাবর লিখিয়াছেন—"আমি একটিকে বাঁচাইতে যাইয়া দুইটাকেই হারাইলাম।" কিন্তু বাবরের ন্যায় নির্ভীক এবং সাহসী ব্যক্তি চুপ্ করিয়া থাকিবেন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে, তিনি পুনরায় মাত্র দুই শত চল্লিশ জন সঙ্গী সহ ঐ দুই রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন, কিন্তু রাখিতে পারিলেন না, পুনরায় বিতাড়িত হইতে

হইল। অবশেষে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল রাজ্য জয় করেন। এ সময়ে কাবুল বলিতে শুধু কাবুল এবং গজনি প্রদেশকেই বুঝাইত। ঐ অংশটাকে আমরা পূর্ব্ব-আফগানিস্থান নামে অভিহিত করিতে পারি। এ সময়ে হিরাট্ একটী স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল, কান্দাহার, বাজৌর, সোয়াট এবং পেশোয়ার প্রভৃতি কাবুলের সহিত সম্পর্ক বিরহিত প্রধানদের দ্বারা শাসিত হইত। সমতল ভূমির অধিবাসী বিবিধ জাতি সমূহ এবং নিম্ন উপত্যকার অধীবাসীরা ঐ দেশের রাজাদের অধীনতা স্বীকার করিত। ঐ সময়ে কাবুলে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল, রাজা আবদুল রিজাক্ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তার পুত্র মুহম্মদ মকিম কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এইরূপ অশান্তি ও গোলযোগের সুযোগেই বাবর কাবুল অতি সহজে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাবুল-বিজয়

কাবুলের রাজা হইয়া বাবরের মনে ভারত-জয়ের ইচ্ছা হইল। কারণ ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ভারত জয় করিয়া অনেক ধন রত্ন লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহাও

ভারত-জয়ের আশা

তাঁহার অজানা ছিল না, সুতরাং তিনি তাঁহার যে তুর্কী মুঘল ও আফগান সেনা ছিল, তাহাদের লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

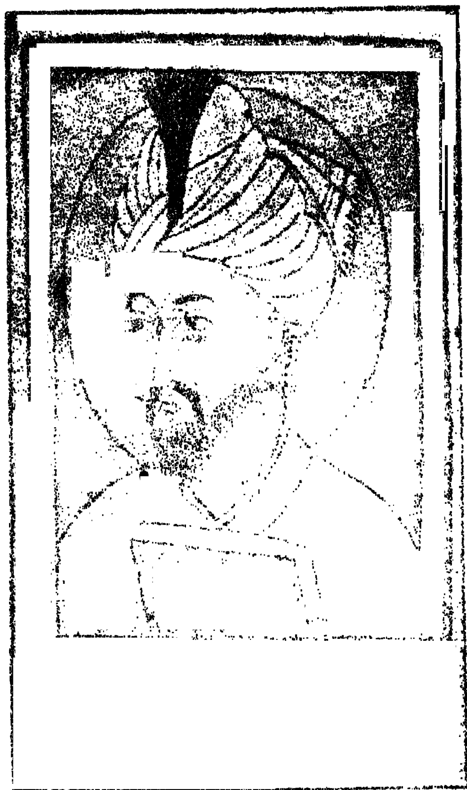


দ্বিতীয় অধ্যায়



বাবরের ভারত-বিজয়

বাবর তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন—"৯১০ হিজিরী অব্দে [১৫০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ) কাবুল-বিজয়ের সময় হইতে আমি সর্ব্বদাই হিন্দুস্থান বশীভূত করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু নানা কারণে পারি নাই, কোনবার হয়ত আমার আমিরগণ বাধা দিয়াছেন, কখনও বা আমি নিজেই কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই, কোন সময়ে আমার ভ্রাতৃগণ নানারূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা



बाबर

করিতে পারি নাই। কিন্তু অবশেষে নানারূপ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ৯২৫ হিজিরী অব্দে আমি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং এই সময় হইতে ৯২৫—৯৩২ হিজিরী (১৫২৬ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত আমি হিন্দুস্থানের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নিরত ছিলাম, এবং সাত আট বৎসরে সসৈন্যে পাঁচবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পঞ্চমবার মহান্ পরমেশ্বর করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সুলতান এব্রাহিমের ন্যায় প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিয়া আমাকে গৌরবপূর্ণ হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন।" বাবর যখন চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইব্রাহিমের শাসন-ক্ষমতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার রাজত্বকালে রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। ইব্রাহিমের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা দৌলত খাঁ এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলাউদ্দীন ওরফে আলম খাঁ পলায়ন করিয়া কাবুলে বাবরের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। বাবর এইরূপ উত্তম সুযোগ উপেক্ষা করা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিলেন না, তিনি মনে করিলেন

আলম খাঁর ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পাইলে অতি সহজেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আলম খাঁকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল সৈন্যসহ অচিরে তিনি পাঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবর অতি সহজেই উক্ত প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং আলম খাঁকে দিবলপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু দৌলত খাঁর আচরণে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত সেইরূপ সদ্ব্যবহার করিলেন না।

দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান

বাবর পঞ্জাব-রক্ষার জন্য কতিপয় বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষকে সেখানে রাখিয়া সৈন্য-সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য কাবুলে গমন করিলেন। বাবর পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবার পরই দৌলতখাঁ যুদ্ধ করিয়া আলম খাঁকে দিবলপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আলম খাঁ বিপন্ন অবস্থায় কাবুলে গমন করিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাবর আলম খাঁর সহিত বার হাজার সৈন্য সহকারে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। দৌলত খাঁ চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য

প্রস্তুত হইলেন কিন্তু মুঘলের আক্রমণের কাছে তাহার সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। দৌলত খাঁর সৈন্য-দলকে ঐ ভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়া বাবর ধীরে ধীরে পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে আসিয়া সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

বাবর সৈন্যসহকারে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা ইব্রাহিম লোদী জানিতে পারিয়া সসৈন্যে পাণিপথের ভীষণ প্রান্তরভূমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। আমরা এখানে বাবরের আত্মচরিত হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাবর লিখিয়াছেন—

পাণিপথের যুদ্ধ
—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ

"আমাদের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। সম্রাটের সেনাপতি ও হস্তীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাঁহার অর্থের কোন অভাব ছিল না, কেননা তিনি পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত ধনরাশির অধিকারী ছিলেন। এই ধনরাশি প্রচলিত মুদ্রায় আবদ্ধ ছিল, এজন্য তিনি অতি সহজেই সে অর্থের ব্যবহার করিতে পারিতেন। শত্রুগণ যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে যে সকল যুদ্ধব্যবসায়ী বেতন গ্রহণ

করিয়া কাজ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিবার রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই সৈন্যদিগকে বধিনদি (Badhin di) বলে। যদি ইব্রাহিম এই রীতির অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আরও এক লক্ষ কি দেড়লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রত্যেক বিষয় মঙ্গলের জন্যই পরিচালিত করিয়াছিলেন। এমন কি, নিজের সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না; তিনি আপনার ধনরাশিও ব্যয় করিতেন না। তিনি যতদূর সম্ভব কৃপণ ও ধনসঞ্চয়ে অপরিমিত প্রয়াসী ছিলেন, এরূপ অবস্থায় সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট রাখা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং সৈন্য পরিচালনা সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলেন; তিনি বিশৃঙ্খল ভাবে অভিযান অথবা প্রস্থান করিতেন, এবং ভবিষ্যত দৃষ্টি না করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যে সময় সৈন্যগণ পাণিপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আপনাদের অবস্থান-ভূমি কামান. বৃক্ষ-শাখাও পরিখা দ্বারা সুদৃঢ় করিতেছিল তখন দরবেশ মোহাম্মদ সারবান আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের অবস্থান-ভূমি এরূপ সুদৃঢ় করিয়াছেন যে, ইহা সম্ভবপর নহে যে, তিনি কখনও এখানে আসিতে উদ্যত হইবেন।

উভয় সৈন্য যুদ্ধের জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়াও কয়েক দিন নীরব রহিল। কেহই প্রথম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল না। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ২০শে এপ্রিল তারিখ রাত্রিকালে বাবর সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে শত্রু শিবির আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মুঘলেরা সে রাত্রিতে পরাজিত হওয়ায়, ইব্রাহিম মনে করিলেন যে শত্রুপক্ষীয়েরা সেরূপ বলশালী নহে, কাজেই পরদিন প্রত্যূষে সসৈন্যে গড় ও পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুদলের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। এইবার দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিবা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল।

পাণিপথের যুদ্ধ আরম্ভ

আফগান-সৈন্য সংখ্যায় অপরিমিত হইলেও নেতৃত্বের অভাবে ও অযোগ্য সেনাপতির পরিচালনায় ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র আফগান সৈন্য স্বীয় প্রভুর কার্য্যে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিল। ইব্রাহিম লোদী শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইলেন। মুঘল সৈন্যেরা তাঁহার ছিন্ন শির বাবরের নিকট আনয়ন

করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বাবরের সেনাপতি ওস্তাদ আলির অধীনে গোলন্দাজ সৈন্যগণ অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল।

কামানের ব্যবহার

ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কখনও কামানের ব্যবহার হয় নাই। মুঘল সৈন্যেরা সংখ্যায় অল্প হইলেও এই যুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতা এবং যুদ্ধপটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। বাবর এই যুদ্ধ-বিজয়ের পরে স্বীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"পরম কারুণিক পরম শক্তিশালী জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এই বিজয় ব্যাপার আমার কাছে অতি সহজসাধ্য হইয়াছিল এবং সেই বিপুল সৈন্য-বাহিনী অর্দ্ধ দিবসের মধ্যেই ধূলিবৎ উড়িয়া গিয়াছিল।"

এই ভাবে অতি সহজে রণক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিবার পর বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং পরদিবস প্রত্যূষে নিজে আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন।

আগ্রা ও দিল্লী অধিকার

২৭শে এপ্রিল শুক্রবার দিল্লীর প্রত্যেক মস্‌জিদে মস্‌জিদে এই রণ-বিজয়ী নূতন সম্রাটের নামে খেত্‌বা পঠিত হইয়াছিল।

বাবর আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া অত্যন্ত প্রীতি-লাভ করিলেন। রাজকোষের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ তাঁহার



বাবরের সেনাপতি ওস্তাদ আলির অধীনে গোলন্দাজ সৈন্যগণ
অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। মুঘল ভারত পৃ ১৪

হাতে পড়িল। অর্থ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। অর্থ বিতরণ করাতেই অর্থের সার্থকতা ইহা তিনি মনে করিতেন, কাজেই সেই রাজকোষের প্রাপ্ত অগণিত ধনরাশি অর্থলোভী সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। রাজকুমার হুমায়ুন যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই জন্য বাদশাহ তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ সতের লক্ষ দাম (প্রায় তিনলক্ষ টাকা) প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বেগ নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য ও পারদর্শিতা অনুসারে ছয় লক্ষ হইতে দশ লক্ষ দাম পর্য্যন্ত পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ, শিবির-সঙ্গী ও দোকানদারেরা পর্য্যন্ত খয়রাত লাভ করিয়াছিল। যে সকল রাজকুমারেরা উপস্থিত ছিলেন না এবং যে সমুদয় আত্মীয় স্বজনগণ দেশে ছিলেন তাহাদের জন্যও স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও ক্রীতদাস-দাসী ফরগণা, খোরশান এবং কাশঘর ও পারস্যের বন্ধুবান্ধবগণকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে মুক্ত হস্তে দান করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা রাজ্যশাসন-সংরক্ষণের জন্য রাজকোষে সঞ্চিত রাখিলেন।

বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভীষণ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ভারতের

অনেক স্বাধীন নৃপতিগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। দিল্লীর শাসনাধীন অনেক প্রদেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। আগ্রার চারিদিকে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, —"আমি যখন আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন গ্রীষ্মকাল, তারপর সহরে লোকজন একেবারেই ছিলনা, সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। সহরের লোকেরা আমাদিগকে ঘৃণা করিত এবং শত্রুতা করিয়া বিদ্রোহী হইয়া চুরি ও ডাকাতি করিতেও ইতস্ততঃ করিত না। আবার এমনি আশ্চর্য্য যে এ বৎসর অতি গরম পড়িয়াছিল, অনেকে গ্রীষ্মের দরুণ উত্তাপে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিল।" ইহার ফলে বাবরের অনেক প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধা এবং বেগ বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এইরূপ অসন্তুষ্টির কারণ দেখিয়া বাবর এক দরবার আহ্বান করিয়া সমস্ত বেগকে বলিলেন—"আমাকে যারা বন্ধু বলে মনে করেন, আমি আশা করি তাহারা কেহ হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিবেন না। আর যদি কেহ আমাকে ত্যাগ করিয়া

যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা যাইতে পারেন আমি কোন বাধা দিব না।—তাঁহাদের কাছে এইরূপ প্রস্তাব করিবার পর অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ নীরব রহিলেন, আর কেহ কোন কথা বলিলেন না।

বেগেরা ভারতবর্ষকে একেবারেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। বাবর হিন্দুস্থান বিজয়ের পর খাঁজেকানান নামক একজন সম্ভ্রান্ত বেগকে গজ্‌নির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দিল্লীর প্রাচীর গাত্রে লিখিয়াছিলেন—

If Safe and sound I pass the Sind,
Damned, if ever I wish for Hind;
বিধি যদি দয়া করে সিন্ধু দেশটা করেন পার।

হিন্দুস্থান—সে মাথায় থাকুন,—
এ জীবনে ভাব্‌বোনা আর!

বাবর তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"Return a hundred thanks, O Babar,
for the bounty of the merciful God
Has given you Sind, Hind, and numerous
kingdoms;

If, unable to stand the heat, you long
for cold,
You have only to recollect the frost and
cold of Ghazni.'

হাজার কুর্ণিস জানাই আমি পরম দয়াল খোদার পায়,
সিন্ধু, হিন্দ সে সোণার রাজ্য পেলেম আমি যাঁরি দয়ায় !
হিন্দুস্থানের দীপ্ত তপন যদিই বা হায় ! সইতে নারি !
বরফ শীতল গজ্‌নির কথা রইব মনে স্মরণ করি।

এই ভাবে গোলযোগ মিটিয়া গেল বটে কিন্তু অশান্তি আরম্ভ হইল অন্য দিক্ দিয়া—সে-কথাই এইবার বলিব ! বাবর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সৈন্যগণের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান থাকিলে কার্য্য করা সম্বন্ধে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এজন্য অর্থ দ্বারা, মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা এবং নানারূপ কৌশল দ্বারা তিনি তাহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই একদল স্বাধীনতাপ্রিয় বীর রাজাদের সন্তুষ্ট করিতে। প্রথম অবস্থায় রাজধানীতে ও রাজ্য-মধ্যে যে অশান্তি ও গোলযোগ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসন-দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা ধীরে-

ধীরে নগরবাসীদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিল, তাহারা বুঝিতে পারিল যে বাবর স্থায়ীভাবে এদেশ শাসন করিবেন এবং এদেশেই বাস করিবেন, অন্যান্য বিজেতাগণের ন্যায় লুণ্ঠন, অত্যাচার এবং অবিচারই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ অবস্থার দরুণ তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিপন্ন অবস্থায় থাকিতে হইল না, ধীরে ধীরে আবার গ্রামের লোকেরা গ্রামে আসিল, দোকানদারেরা দোকান খুলিল, ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিল, আবার রাজধানী ধনেধান্যে পরিপূর্ণ হইল। *

নগরে শান্তি প্রতিষ্ঠা

* সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ বলেন—Th firmness of the conqueror was soon rewarded in a different manner. No sooner did the inhabitants, Muhammadan settlers and Hindu landowners and traders, recognise that Babar intended his occupancy be permanent, than their fears subsided. Many proofs, meanwhile, of his generous and noble nature had affected public opinion regarding him. Everyday then brought accessions to his standard. Villagers and shopkeepers returned to their homes and abundance soon reigned camp.

বাবর নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বিধাতার যদি আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর সকলেও যদি আমার শত্রু এবং বিদ্রোহী হয় তত্রাচ আমার একটী শিরাও কাটিতে সক্ষম হইবে না।

বাবর অল্প সময়ের মধ্যেই নিষ্কণ্টক হইয়া হিন্দুস্থানের শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সমরখন্দ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এইবার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হুমায়ুনকে সমরখন্দ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন কিন্তু হুমায়ুন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

বাবর পুত্র হুমায়ুনকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। হুমায়ুন সমরখন্দ হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া জনকজননার সমীপে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবর এইরূপ ভাবে পুত্রের মিলনে কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে স্বরচিত জীবন-চরিতে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন—"আমি

---

† "Brandish the sword of the world as you may,
It can cut no vein if God Says, 'nay',

হুমায়ুনের মাতার সহিত হুমায়ুনের বিষয় আলাপ করিতে-ছিলাম এরূপ সময় হুমায়ুন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এইরূপ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে আগমন করায় আমাদের হৃদয় গোলাপ-মুকুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত ও আমাদের নয়ন, প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করিল। ভোজনের সময় আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা আমার নিয়ম কিন্তু এই উপলক্ষে তাহার সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমরা কিয়দ্দিন এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলাম।”

এইখানে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরও তাঁহাকে যে সমুদয় যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল সে কথা বিবৃত করিব। এসময়ে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটী স্বাধীন মুসলমান ও হিন্দুরাজ্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যে রাজপুতেরা বিশেষ প্রধান ছিলেন। বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন সংগ্রামসিংহ ছিলেন চিতোরের রাণা। বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, তিনি বহু সৈন্য লইয়া বাবরকে আক্রমণ করিলেন। আগ্রার দশ ক্রোশ দূরে, শিক্রীর

চিতোরের রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ

মাঠে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে সমস্ত রাজপুত শক্তি মিলিত হইয়াছিল। রাণা অসাধারণ বীর এবং দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজপুত জাতির আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইতেন। রাণাসিংহ "সমরশত-বিজয়ী" নামে প্রখ্যাত ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার একটী হাত ও চক্ষু গিয়াছিল, একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে আশীটি আঘাত চিহ্ন ছিল। রাণাসঙ্গ বহু সৈন্য লইয়া বাবরকে আক্রমণ করিবার জন্য খানুয়ার মাঠে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। মুঘল সৈন্যেরা অগণিত রাজপুত সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।—তখন বাবর সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"জয় পরাজয় সমুদয়ই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু কাপুরুষের মত মরিয়া লাভ কি? যদি মরিতে হয়, যুদ্ধেই মরিব। আমি ভীরু কাপুরুষের মত পলায়ন করিব না।"

খানুয়ার যুদ্ধ

তাঁহার এই উৎসাহ-বাণীতে সৈন্যদের প্রাণ নবোৎসাহে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। ভীম বিক্রমে মুঘলসৈন্যেরা রাজপুতগণকে আক্রমণ করিল। বাবর নিজে অতিরিক্ত সুরাপায়ী ছিলেন, তিনি শপথ করিলেন যে জীবনে আর কখনও সুরাপান করিবেন না। তিনি নিজ হস্তে সমুদয়



বাবর সুরা পাত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

সুরাপাত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নবোৎসাহে বলীয়ান্ মুঘলসৈন্যেরা ভীম বিক্রমে রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিলেন। মুঘলদের কামানের গোলার কাছে রাজপুতেরা দাঁড়াইতে পারিলেন না। সংগ্রামসিংহ পরাজিত হইয়া চিতোরে ফিরিয়া গেলেন। এই পরাজয়ের পর তিনি মাত্র দুই বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। উদয়পুরের নিকট আজও তাঁহার সমাধি-মন্দির আছে।

সুরাপান পরিত্যাগ

বাবর এই ঘটনার পর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হুমায়ুন প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। আগ্রার সুনিপুণ এবং সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা প্রাণপণ যত্ন দ্বারা কিছুই করিতে পারিলেন না। বাবর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম পুত্রের জীবন-রক্ষার জন্য বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে বাবরকে একজন দরবেশ বলিলেন—যদি কেহ যুবরাজের জন্য প্রাণ দেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইতে পারে। বাবর বলিলেন—"আমার প্রিয় পুত্রের জীবন-রক্ষার জন্য আমিই আমার প্রাণ দিব।" এইরূপ

বাবরের মৃত্যু ও চরিত্র

বলিয়া বাবর পুত্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ভগবানের নিকট পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে হুমায়ুনের শয্যার চারিদিক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন,—"আমি ব্যাধি গ্রহণ করিলাম, আমি ব্যাধি গ্রহণ করিলাম।" ফলে তাহাই হইল! সেদিন হইতে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, আর বাবর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সত্য সত্যই হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং সেই রোগে বাবর প্রাণত্যাগ করিলেন। *

বাবর মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আহ্বান করিয়া হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন —"আশা করি, আপনারা হুমায়ুনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন এবং বন্ধুর ন্যায় তাঁহার রাজকার্যে সাহায্য করিবেন।" হুমায়ুনকে বলিলেন—"আমি তোমাকে ও আমার সমুদয় আত্মীয়বন্ধুবান্ধবগণকে ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিলাম। তুমি তোমার ভ্রাতাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে না।" ইহাই মহাপ্রাণ বাবরের জীবনের শেষ

* Babar—by S. M. Edwardes, G. S. I. G. V. O. Page 127.

কথা। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর পরলোক গমন করিলেন। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এবং সমস্ত নরনারী তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। বাবরের অতি প্রিয়তম বন্ধু খাঁজা কালন্ তাঁহার মৃত্যুজনিত শোকে বিহ্বল চিত্তে লিখিয়াছিলেন,—

Alas ! that time and the changeful heaven
Should exist without thee ;
Alas ! and Alas ! that time should remain
and thou shouldst be gone.

দুনিয়াটা রইবে অটল রইবে সবি ছিল যেমন
তুমি শুধু বন্ধু আমার ! অজানা দেশে করলে গমন !
কালস্রোত বইবে সদাই রইবে ধরা যেমন ছিল !
আসবেনা আর শুধুই তুমি কাল তোমার যে সবই নিল।"

বাবরের লিখিত আদেশ ছিল যে মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ যেন কাবুলে স্থানান্তরিত করিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কাবুলের এক পরম রমণীয় গিরিউপত্যকায় এক প্রফুল্ল কুসুমসুবাসিত উদ্যানে তাঁহার সমাধি বিরাজিত। নদীর ধারা সে উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—পাখীরা

সেইখানে মনের আনন্দে গান করে। যাত্রিগণ দলে দলে এখনও সেখানে উপস্থিত হইয়া পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাঁহার সমাধির উপর কোন আবরণ নাই! নীল আকাশের তলে তাঁহার সমাধি-শয্যা—মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর মন্দির—শান্ত, নির্জ্জন, ও কমনীয়। এই সমাধির উপরে যে খোদিত লিপিটি আছে তাহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরচিত। তাহা এইরূপ—

A Ruler from whose brow shone the Light of God, was that Backbone of the faith, Muhammad Babur Padsha. Together with majesty, dominion, fortune, rectitude, the open hand and the firm Faith, he had shone in prosperity, abundance, and the triumph of victorious arms. He won the material world and became a moving light ; for his every conquest he looked, as for Light, towards the World of souls. When Paradise became his dwelling, a nd Ruzwan [door-keeper of paradise] asked me the date, I gave him for

answer—"Paradise is for ever Babur Padshah's abode."

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের প্রতি তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। শাহজাহান্ তাঁহার সমাধি-মন্দিরের নিকট একটী মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন আর জাহাঙ্গীর খোদিত লিপি স্থাপন করিয়া তদীয় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যু-সময়ে তাঁহার মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি দুই কারণে মানবসমাজে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ তাঁহার ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আত্মজীবন চরিত। এই গ্রন্থখানা তাঁহার অমর কীর্ত্তি। বাবর সরলহৃদয় সদাপ্রফুল্ল, সাহসী, তেজস্বী, প্রতিভাশালী এবং আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার জীবন নানা দুঃখের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তবু তিনি একদিনের জন্যও নিরাশ বা ভগ্নহৃদয় হন নাই। ক্ষমা ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি অতি বড় শত্রুকেও মার্জ্জনা করিয়াছেন। বাবর কবি ছিলেন, পারস্য ও তুর্কী ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কবিতা শব্দ-সম্পদে

এবং ভাষার মাধুর্য্যে প্রসিদ্ধ। স্থপতিবিদ্যায় এবং কৃষিকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি উদ্যান-বাটি নির্ম্মাণ করিতে এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বড় বেশি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। অতি শৈশব হইতেই তাঁহাকে অসিহস্তে রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানানুরাগ ছিল। শারীরিক বলও ছিল বাবরের অসাধারণ। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি আমোদের জন্য গঙ্গানদী সন্তরণ পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি। অভিযান-কালে যে সকল নদী আমার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গঙ্গা ব্যতীত আর সকল নদীই সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। বাবর একাদিক্রমে চল্লিশ ক্রোশ অশ্ব-পৃষ্ঠে গমন করিতে পারিতেন।

সঙ্গীতানুরাগ এবং সুরাপান প্রবৃত্তি তাঁহার এত বেশি ছিল যে তিনি বন্ধুগণের সহিত কি ভাবে মদ্যপান করিতেন সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের দরুণ কোন কার্য্য তিনি পণ্ড করেন নাই। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা সঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাঁহার মনে হইল যে, সুরাপান ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ। যে মুসলমান, শাস্ত্রের বিধান অমান্য করিয়া চলে

তাঁহার প্রতি বিধাতা অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন—এইজন্য তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত পান পাত্রাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দীন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বাবর তাঁহার সুরাপান ত্যাগের ঘটনাটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রজাদিগকে তমখা [Stamp Tax] হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

বাবর তাঁহার হিন্দুস্থান বিজয়ের পর শাসন সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলা বিধানের পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, কাজেই ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই।

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

—)*(—

হুমায়ুন ও শেরসা

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশেরউদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাবরের কামরান্, হিন্দোল ও মিরজ্বা আস্করী নামে আরও তিন পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র হুমায়ুনকেই সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। হুমায়ুন পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতা কামরান্‌কে কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন। কাবুল রাজ্যকে এই ভাবে ভারতসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হুমায়ুনের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। এই ব্যবস্থায় তাঁহাকে পরে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, কেননা ঐসকল প্রদেশ হইতে মুঘলেরা সৈন্য সংগ্রহ

হুমায়ুনের ভ্রাতৃপ্রেম

ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেন। এ সময়ে ভারতবর্ষে ভাল করিয়া মুঘল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কাজেই হুমায়ূনকে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কামরান্‌কে কাবুল ও পঞ্জাব রাজ্যদান করিয়া তিনি অন্তর্বিদ্রোহ দূর করিবার নিমিত্ত হিন্দোলকে সম্বলের এবং মির্জ্জা আস্করীকে মেওয়াতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হুমায়ুনের জীবন নানারূপে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কথাটা প্রকাশ পাইলে পর ঐব্যক্তি ব্যর্থমনোরথ হইয়া গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান অধিপতি বাহাদুরশাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ূন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাহাদুরশাহকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। বাহাদুরশাহ শরণাগত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

এদিকে আর এক ঘটনা ঘটিল। দিল্লীর আফগান বংশীয় শেষ নৃপতি ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলাউদ্দীনও বাহাদুরশাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা লোদী বংশীয়দের সাহায্যে উন্নতিলাভ

করিয়াছিলেন বলিয়া বাহাদুরশাহ আলাউদ্দীনের প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারি প্ররোচণায় এক বিপুল সৈন্যবাহিনী স্বীয় পুত্র তাতার খাঁর অধীনে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হুমায়ুন—এই শত্রুদলকে সহজেই পরাজিত করিলেন, তাতার খাঁ যুদ্ধে নিহত লইলেন। এইবার তিনি বাহাদুরশাহকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং বাহাদুরশাহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গুজরাট জয় করিতে সমর্থ হইলেন। গুজরাট বিজয় করিয়া হুমায়ুন বাহাদুর শাহের গুপ্তধন-রাশি লাভ করিতে পারিয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেক সৈনিককে একতাল পরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

গুজরাটের বাহাদুরশাহ

গুজরাট-বিজয়ের পর তাঁহাকে শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল, কেননা দীর্ঘকাল দূরে অবস্থান করায় রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য ভ্রাতা মির্জ্জা আস্করীর উপর গুজরাটের শাসন ভার অর্পণ করিয়া তিনি রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হুমায়ুন গুজরাট পরিত্যাগ করিবার পরেই মুঘলগণ আত্ম-কলহ দ্বারা বিশেষ ভাবে হীনবল হইয়া

পড়িলেন এবং সুযোগ পাইয়া বাহাদুর শাহ পুনরায় গুজরাট অধিকার করিয়া লইলেন।

হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন—আফগান বংশীয় শেরখাঁ, মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

শেরখাঁর পরিচয় ও বীরত্ব

শেরখাঁর পরিচয় এইরূপ। ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। শেরের পিতামহ ইব্রাহিম সুর ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীর অন্তর্গত হিস্‌সারে ফিরোজা নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে আনুমানিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদের জন্ম হয়। শেরখাঁর পিতা হোসেন স্বীয় ক্ষমতাবলে সাসারাম ও তাণ্ডার জাইগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেরখাঁ বাল্যকালে কিছুদিন জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পিতা ইহাকে একটী জাইগীর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিমাতার প্ররোচনায় সেই জাইগীর হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। পিতৃস্নেহ ও জাইগীর হইতে বঞ্চিত হইয়া ফরিদ আগ্রা যাইয়া সম্রাট্ বাবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে পৈত্রিক জাইগীর পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

শেরখাঁ মুঘল শিবির পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিহারে আগমন করেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা সুলতান মামুদ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই সুলতান মামুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জামাল খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজমাতা সুলতানা দাদু প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া শেরখাঁর উপর রাজ্যশাসন সম্পর্কিত অনেকটা ভার ন্যস্ত করেন। সুলতানা দাদুর মৃত্যুর পর শেরখাঁ বিহারের নাবালক শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি হইয়া বিহার রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ সময়ে চুনারের দুর্গের অধিকারিণী মালিকা নামে এক বিধবা রমণীকে বিবাহ করিয়া শেরখাঁ প্রচুর ধনরত্নের সহিত ঐ দুর্গেরও অধিকারী হইলেন। বিহারের নাবালক শাসনকর্ত্তার উপর শেরখাঁর অসাধারণ প্রভাব দেখিতে পাওয়ায় বিহারের ওমরাহগণ শেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। বিহারের বিদ্রোহী সৈন্যদল সংখ্যায় বেশী হইলেও শেরখাঁ তাহাদিগকে সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর শেরখাঁ বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণ করেন। বঙ্গদেশের রাজা উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন ও শেরখাঁ

এ-সময়ে হুমায়ুন গুজরাটের বিদ্রোহ-দমনে বিব্রত ছিলেন, কাজেই শেরখাঁর পক্ষে বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শেরখাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, হুমায়ুন শেরখাঁকে পরাজিত করিতে এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া চুনার দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। শেরখাঁ তাঁহার অধীনে দুর্গ শাসন করিতে স্বীকৃত হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের জন্যই সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়াতে বাদশাহ চুনার পরিত্যাগ করেন।

এইবার সুযোগ বুঝিয়া শেরখাঁ আফগানদিগকে সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি কোন আফগান্ সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিবেন এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি আফগান্ শক্তি সুদৃঢ় ভাবে পুনর্গঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আফগান্ সেনার সাহায্যের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, কাজেই দলে দলে আফগানসেনা আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল—

এইভাবে শেরখাঁ একদল ক্ষমতাশালী রণনিপুণ আফগান সেনার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শেরখাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, হুমায়ুন শেরখাঁকে পরাজিত করিতে এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া চুনার দুর্গের অধিকারে অগ্রসর হইলেন। হুমায়ূন চুনার দুর্গ অধিকার করিলেন এবং পরিশেষে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের সুলতান মুহম্মদশাহ শেরখাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাদশাহ হুমায়ূনের নিকট আপনার পরাজয়ের ভীষণ দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাদশাহ তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শেরখাঁ বাদশাহের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন—তাঁহার সৈন্যের পরাজয় বার্ত্তা জানিতে পারিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ যে ধনরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া গৌড়-নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৈত্রিক জাইগীর শেসারামে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ূন—কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ব্যতিরেকে অতি সহজেই গৌড়নগর অধিকার

করিয়া আপনার নামে খোত্‌বা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন।

হুমায়ুন বাদশাহ বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-কৌতুকে নিমজ্জিত হইলেন। ওদিকে শেরখাঁ পিতৃ জায়গীরে উপনীত হইয়া হুমায়ুনকে পরাজিত এবং তাঁহার বিনাশের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হুমায়ুনের বঙ্গ-বিজয়

প্রথমতঃ শেরখাঁ রোটাশ দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গ মধ্যস্থ বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি লাভ করিলেন। রোটাশ দুর্গ জয় করিয়া শেরখাঁ পরিবারবর্গের জন্য নিরাপদ স্থানের সংস্থান করিতে পারিলেন। তাঁহার এই বিজয়ে তদীয় বন্ধুগণও বিশেষ উৎসাহিত হইয়া সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই বার শেরখাঁ ধন-সম্পদে এবং শক্তি-সঞ্চয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া হুমায়ুনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে বঙ্গদেশে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে মুঘল সৈন্যেরা জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অশ্ব, উষ্ট্র ও অন্যান্য ভারবাহী জীবজন্তু মৃত্যু-

মুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময় হুমায়ুন জানিতে পারিলেন যে শাহজাদা হিন্দাল কুচক্রী অমাত্যগণের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং বিশ্বস্ত রাজ-পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া নিজের নামে খোত্‌বা প্রচারিত করিয়াছেন এবং কামরান্‌ সসৈন্যে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভ্রাতাগণের এই বিদ্রোহের সংবাদ জানিতে পারিয়া হুমায়ুন চিন্তিত হইলেন এবং জাহাঙ্গীর কুলিবেগ নামক একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন।

শেরখাঁ এইবার বুঝিলেন যে তাঁহার প্রার্থিত সুযোগ উপস্থিত। মুঘল সৈন্যেরা রোগ ভোগ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ওদিকে বাদশাহও ভ্রাতাগণের বিদ্রোহ-দমনের জন্য রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। শেরশা চৌশা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মুঘল সৈন্যের গতি রোধ করিলেন। কাজেই মুঘলসৈন্যদের সেখানে তিনমাস অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তার পর শেরখাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিলেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খোতবা এবং শিক্কা প্রচলিত রাখিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার

শাসন করিবেন। মুঘল সৈন্যেরা এবং বাদশাহ শেরের অঙ্গীকারে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর সতর্ক রহিলেন না। শেরখাঁ একদিন প্রাতঃ কালে হঠাৎ মুঘলদিগকে আক্রমণ করিলেন। মুঘল সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা কাজেই তাহাদের অতি শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। হুমায়ুন গঙ্গানদী পার হইবার জন্য যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আফগান সেনারা তাহা হস্তগত করিয়াছিল বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নদীগর্ভে প্রাণ হারাইল। হুমায়ুন প্রাণরক্ষার জন্য নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক ভিস্তি তাহার বায়ুপূর্ণ মশকের সাহায্যে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মুঘল সৈন্যেরা পরাজিত হইল। এমন কি হুমায়ুনের বেগম এবং অন্যান্য পুরমহিলারা পর্য্যন্ত শেরখাঁর হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। শেরখাঁ তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে মুঘল সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শেরখাঁ বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তিনি বঙ্গদেশে গমন করিয়া জাহাঙ্গীর কুলিবেগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া পাত্রমিত্র সঙ্গে করিয়া নিজনামে খোত্‌বা এবং শিক্কা প্রচলিত

করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন—এবং শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। শেরশাহ বঙ্গদেশের শাসন শৃঙ্খলা সুসম্পন্ন করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরসাহ বিপুল সৈন্য লইয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং গঙ্গার আশে পাশের সমুদয় প্রদেশ অধিকার করিলেন। বাদসাহ এই সংবাদ পাইয়া একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যসহ কনোজের নিকটে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষই প্রথমতঃ আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এ-সময়ে বর্ষাকাল সমাগত হইয়াছিল, হুমায়ুনের শিবির জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কাজেই আর সময় নষ্ট না করিয়া তিনি শেরশাহের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং নিরুপায় হইয়া লাহোরে কামরাণের নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শেরশাহ মুঘল সৈন্যদিগকে সেখানেও পরাস্ত করিলেন। কামরান্ শেরখাঁর সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে পঞ্জাব রাজ্য অর্পণ করিয়া কাবুলে চলিয়া গেলেন।

এদিকে হুমায়ুন গৃহহারা ও একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তিনি সিন্ধু ও মাড়োয়ারের রাজা

মালদেবের সাহায্য প্রার্থী হইলেন, কিন্তু কোন সাহায্য পাইলেন না। বরং এই দুষ্টবুদ্ধি নৃপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া শেরশাহের হস্তে অর্পণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। হুমায়ুন দৈবাৎ এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে অমরকোটের দিকে প্রস্থান করেন।

হুমায়ুনের নিরাশ্রয় অবস্থা

নিরুপায়, নিরাশ্রয় নৃপতিকে সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ সিন্ধুদেশের ভীষণ মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের যে কি ভীষণ কষ্ট হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। জলতৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া মুঘলেরা চীৎকার করিতেছিল, কেহ কেহ জিহ্বা বাহির করিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছিল। একটী কূপের পার্শ্বে উপনীত হইলে জল তুলিবার অবসরটুকু কেহ সহ্য করিতে না পারিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া জলোত্তলকপাত্র কূপমধ্যে পতিত হইলে ঐ সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন তৃষ্ণাতুরও কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া মাত্র সাতজন অনুচরসহ বাদশাহ অমরকোটে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। অমরকোটের রাজা হুমায়ুনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত উদার ব্যবহার দ্বারা

প্রীত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন অমর কোটে প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থান করেন। অমরকোটের রাজা বাদসাহকে দুই হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। হুমায়ুন পরিবারবর্গকে অমরকোটে রাখিয়া রাজপ্রদত্ত সৈন্য লইয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিতে গমন করেন। অভিযানের দ্বিতীয় দিন তিনি এক সরোবর-তীরে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময়ে আকবরের জন্ম সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদে প্রীত হইয়া তাঁহার ওমরাহগণ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে হুমায়ুন তাঁহার ভৃত্য জহৌরকে তাহার নিকট যে সকল দ্রব্য ছিল তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। জহৌর দুইশত মুদ্রা, একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার এবং একটী মৃগনাভি কস্তুরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিয়া কস্তুরীর দানা সমাগত বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিলেন। তারপর তিনি করুণ কণ্ঠে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জন্য আমার কেবল মাত্র একটী কস্তুরী আছে, এই কস্তুরীর মধুর সৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে; আমি আশাকরি, আমার এই পুত্রের

আকবরের জন্ম

যশঃ গৌরবে একদিন সমগ্র পৃথিবী গৌরবান্বিত হইবে।'

হুমায়ুনের দুর্গতির পরিসমাপ্তি এখানেই হইল না। ইতিমধ্যে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তারপর সিন্ধুর রাজার সহিত যুদ্ধেও পরাজিত হইলেন। তখন নিরুপায় হুমায়ুন কান্দাহারের দিকে পলায়ন করিলেন। পথে—বীরবর বৈরামখাঁ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে হুমায়ুনের ভ্রাতা মিরজা আস্করী কান্দাহারে কামরাণের প্রতিনিধি-রূপে শাসন করিতেছিলেন, তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক বরং নানা ভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন।

এইবার হুমায়ুন পারস্যের দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।—তিনি যখন কিস্তানের সীমানায় উপনীত হইলেন, তখন পারস্যের রাজার পক্ষ হইতে কিস্তানের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। হুমায়ুন হিরাট গমন করিলেন। হিরাটে পারস্য নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সসম্মানে অভিনন্দিত করিলেন—মোহম্মদ বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পারস্য দরবারে পৌঁছিবার উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা

করিয়া দিলেন। যথা সময়ে হুমায়ুন পারস্তদরবারে উপনীত হইলেন—পারস্যের রাজা অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে স্বীয় দরবারে গ্রহণ করিলেন।

শেরশাহের পাঠান শক্তির প্রতিষ্ঠা

এদিকে হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া শেরশাহ সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া বঙ্গ, বিহার, ও উত্তর পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিশেষ [illegible] সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শেরশাহ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া একে একে রাজপুতনা, মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি জয় করিতে চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশস্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিতে যাইয়া তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বদেশভক্ত মাড়োয়ারগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। মাড়োয়ারে অভিযানে তিনি আশী হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। মাড়োয়ারিদের আক্রমণে আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকষ্টে শত্রু সৈন্য পরাস্ত হইলে শেরশাহ মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত অনুর্ব্বর মাড়োয়ার রাজ্যকে লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছিলেন—"আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলাম।"

১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ অবরোধ করিবার সময়ে ভূগর্ভস্থ বারুদখানায় ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেই অগ্নিতে তাঁহার সারাদেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্গ অধিকৃত না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন—যখন শুনিলেন দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে তখন একটী মাত্র বাণী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—তারপর চিরদিনের জন্য তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। শেরশাহের অমর আত্মা অনন্তকালের জন্য দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিল।

শেরশাহের মৃত্যু

শেরশাহের চরিত্র ও রাজ্যশাসন প্রণালী

শেরশাহ একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল। তিনি আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোনরূপ অসদাচরণ করিতেই ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ভারতবর্ষের মধ্যযুগের

ইতিহাসে বিরল। তিনি রাজ্য শাসনের অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক প্রদেশগুলি অনেক সরকারে ভাগ করেন, সরকারগুলি আবার অনেক পরগণায় বিভক্ত করেন। এইভাবে শেরশাহ তাঁহার সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ হাজার পরগণাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল পরগণা ও সরকারের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, আইন লিখিবার ব্যবস্থা করেন ও ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সমুদয় জমি জরীপ করেন। মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ জমির খাজনা স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রজারা ক্ষেতের ফসল দিয়া কিংবা অর্থ দ্বারা খাজনা দিতে পারিত।

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রজা-সাধারণের হিত সাধন কল্পে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এখনও তাহা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ পথের দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে সরাইখানা ও কূপ ছিল। পথের দুই ধারে অল্প দূরে দূরে হিন্দু ও

মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সরাইখানার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে দস্যু ও তস্করের ভয় সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বিদ্রোহী হইতে সাহসী হয় নাই। অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেন। জমির মাপ সম্বন্ধে শেরশাহ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে আকবরের রাজত্বকালেও কতকটা সেই নীতি পরিগৃহীত হইয়াছিল। শেরশাহ স্থপতি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই সাসারামে যে সৌষ্টবশালী সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও স্থপতি-বিদ্যার অদ্ভুত নিদর্শনরূপে পরিচিত।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইশ্‌লামশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইশ্‌লামশাহের ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি যে সাতবৎসর রাজত্ব করেন সে কয় বৎসর কেবল বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইশলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশু-পুত্র সিংহাসনে বসিলেন। এ সময়ে মুহম্মদ আদিল শাহ বা আদিল ঐ শিশুকে হত্যা করিয়া আদিলশাহ নাম লইয়া

সিংহাসনে বসিলেন। হিমু নামক একজন নীচজাতীয় হিন্দু বেনিয়া এ সময়ে আদিলের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। হিমুর মন্ত্রণাবলে আদিল নানা অত্যাচার করিয়া চারিদিকে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন। বঙ্গ ও মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শেরশাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্জাবে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লী ও আগ্রা পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে পড়িল।

হুমায়ুনের পুনরায় রাজ্য অধিকার

এই সমুদয় সংবাদ হুমায়ুনের অ[illegible] ছিল না। পারস্যের রাজা তমশেপ্ কাবুল ও কান্দাহার জয় করিবার জন্য নির্ব্বাসিত বাদশাহের অধীনে ১৪০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এই সৈন্য দলের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা কামরান্‌কে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করিয়া শীঘ্রই দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুত কামরান্‌কে হুমায়ুন বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। [১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাইমাসে] এই যুদ্ধে বৈরাম খাঁ তাহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া

হুমায়ুন অতি অল্প দিন জীবিত ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় হুমায়ুন পাঠগৃহ হইতে নীচে নামিবার সময় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মাত্র এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হুমায়ুন পরলোক গমন করেন। হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির দিল্লীর একটী প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। হুমায়ুন দেখিতেও যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য, জ্যোতিষ, ও অস্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হুমায়ুনের জীবন উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ও রহস্যপূর্ণ। বিপদের পর বিপদ তাঁহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে তথাপি তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। হুমায়ুনের ভ্রাতৃস্নেহ [illegible]। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিলেও তিনি তাহাদের প্রতি তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এমন কি কামরাণের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার প্রাণদণ্ড বিধানের জন্য ওমরাহগণ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামরান্‌কে অন্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন মৃদুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট যথেষ্ট সমাদরলাভ করিতেন। মুঘলজাতির প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

আকবর বাদশাহ

হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হইল, তখন আকবর রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি পঞ্জাবের সেকন্দরশূরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেকন্দর একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কালানৌর নামক স্থানে আকবরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একখানা ইটের তৈয়ারী সিংহাসনে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এসময়ে আকবরের বয়স ছিল মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। এদিকে তখন দিল্লীর সিংহাসনের চারিদিকে ভীষণ বিপ্লব চলিতেছিল।

হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সেকন্দরশাহ নবীন উৎসাহে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আকবর তাঁহার অভিভাবক বৈরামখাঁর সাহায্যে শত্রু-দমন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে আর এক অশান্তির সৃষ্টি হইল। মুহম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু মুঘল শক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার বীর ও সাহসী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হিমুর পরাক্রম

পথে অতি সহজেই আগ্রা হস্তগত হইল। আগ্রা অধিকার করিয়া অতি দ্রুতবেগে নগর-রক্ষক-দিগের অবহেলায় ও হঠকারিতায় হিমু নগর রক্ষী প্রহরীদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন এবং আপনাকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। আকবরের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, কেবল পঞ্চনদের কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল।

হিমুর এইরূপ বিজয়ে কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আকবর তাঁহার মন্ত্রী ও ওমরাহ-বর্গকে লইয়া এক পরামর্শ সভার আহ্বান করিলেন।

সকলেই তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"শত্রুর সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষের উপর, কিন্তু তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য আমাদের মাত্র বিশ হাজার সৈন্য আছে, এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কাবুলে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। আমরা এই সৈন্যের দ্বারা কাবুল রক্ষা করিতে পারিব। পরে যদি সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সহজেই ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যাইবে।"

বৈরাম অন্যান্য ওমরাহগণের এইরূপ কাপুরুষোচিত মন্তব্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি উহার প্রতিবাদ করিলেন এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আকবর বয়সে বালক হইলেও বৈরামখাঁর এইরূপ মন্তব্য সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। আকবর এমন সুন্দর ভাবে, এমন তেজস্বিতার সহিত তাঁহার মন্তব্য ওমরাহগণের নিকট উপস্থিত করিলেন যে ওমরাহেরাও সকলে পণ করিলেন যে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন। বৈরামখাঁও স্বীয় পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি জীবনে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আকবর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার বৈরামখাঁর উপর অর্পণ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আকবর রাজা হইয়াছিলেন শুধু পঞ্জাব এবং দিল্লী লইয়া—এ-সময়ে ভারতবর্ষে রাজপুতেরা স্বাধীন ছিলেন। আরও অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। মুঘলদিগকে একেবারে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন এইরূপ সংকল্প হিমুর ছিল এবং তদনুরূপ তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন।

হিমু [illegible] পর পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সসৈন্যে সমবেত হইয়াছিলেন। যে পাণিপথের রণক্ষেত্রে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইব্রাহিম লোদি বাবরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার সৈন্যের সহিত মুঘলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৈরামখাঁ খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে হিমুর পরাজয় হইল এবং আকবরের জয় হইল। হিমু ভাবিয়াছিলেন যে রণনিপুণ হস্তীর দ্বারাই তিনি যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবেন, কিন্তু শত্রু সৈন্যের মধ্য ভাগে হস্তী সমূহ লইয়া উপস্থিত হইলে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হস্তীগুলি এমন ক্ষেপিয়া উঠিল যে তাহারা রণক্ষেত্র হইতে বিক্ষিপ্ত ভাবে মাহুতের আদেশ অমান্য করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাতে হিমুর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হিমু নিরাশ হইলেন না, তিনি চারি

সহস্র সৈন্য লইয়া অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রু নিক্ষিপ্ত একটী শরে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তাঁহার পক্ষের সৈন্যেরা হিমুর নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। হিমু ঐরূপ আহত অবস্থায় মুঘলের হস্তে বন্দী হইলেন। বৈরামখাঁ আকবরকে বলিলেন—"হিমুর মুণ্ডটা কাটিয়া ফেল।" আকবর অসহায় বন্দীকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিতে অস্বীকার করিলে, বৈরাম হিমুকে নিজ হস্তে কাটিয়া ফেলিলেন। হিমুর মস্তক কাবুলে ও তাঁহার দেহ দিল্লীর দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে পাণিপথের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই কাবুলের বিদ্রোহের শান্তি হইল। আকবর তাঁহার শত্রুগণকে নিহত ও পরাজিত করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং সূচনাকালে কিরূপ অবস্থা ছিল আমরা একজন সুলেখকের লেখনী হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—"ভারতের সিংহাসন মুঘল পাঠানের পক্ষে ছিল এক প্রকার অভিশপ্ত,কেহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে বহুদিন বহুযুগ ধরিয়া ইহার

উপর বিরাজ করিতে পারে নাই। প্রথম মুসলমান আক্রমণ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান সাক্ষিস্বরূপে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। দাস বংশ গেল, খিলিজি গেল, পাঠানাধিকারের অস্তিত্ব লোপ হইল। শোণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহাপ্লাবনের প্রচণ্ড স্রোতগুলি যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার নূতন কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। চাঘটাই সমরখন্দের অনুর্ব্বর প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণহস্তে ফল-শস্য-ধন-রত্ন-পরিপূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদ-কানন হিন্দুস্থানে পদার্পণ করিল। চাঘটাই মোগল বাবরশাহ পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া আবার অভিশপ্ত সিংহাসনে আসন বিছাইলেন। বাবর গেলেন, হুমায়ুন আসিলেন। আবার শেরশাহ প্রবল হইয়া উঠিলেন। আবার সিংহাসনের আস্তরণ খসিয়া পড়িল; ভারতে মোগলের শক্তি-বিকাশের শেষচ্ছটা পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল; সে মলিনতা যে ইহজন্মে ঘুচিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।" [ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা-১৮৯১]

আকবরশাহের সময় হইতেই মুঘল সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ়রূপ সংস্থাপিত হইয়াছিল। আকবর কিশোর

বয়সে সিংহাসনে বসিলেন। সিংহাসনে বসিবার তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র এবং জৌনপুর অধিকার করিলেন। যে শূরবংশ দিল্লী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল তাহারাও পরাজিত হইল। বৈরামখাঁ খানিখানান্ উপাধি গ্রহণ করিয়া আকবরের অভিভাবক রূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৈরামখাঁ খুব রাগী ও অহঙ্কারী ছিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর তাঁহার অহঙ্কার আরও বাড়িয়া গেল। যখন যাহা খুসী তাহাই তিনি করিতেন। আকবরকে কোন বিষয়ে একটী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। আকবর এ সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় লেখাপড়া না শিখিতে পারিলেও তিনি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন, আবার এ দিকে ঘোড়ায় চড়িতে, তীর নিক্ষেপ করিতে এবং তরবারি হাতে যুদ্ধ করিতেও পারিতেন অসাধারণ। তাঁহার বৈরামখাঁর অধীনতা আর ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বৈরামখাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি এখন নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি যেরূপ বিশ্বস্ততা এবং সাধুতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ ভাবেই

জ্ঞাত আছি। আপনি মক্কা যান ইহাই আমার অনুরোধ, আপনার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আমি জায়গীর দিব।” বৈরাম প্রথমে সম্মত হইলেন, কিন্তু পরে বিদ্রোহী হইলেন। আকবর অনায়াসে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সমুদয় দোষ ক্ষমা করিলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার মক্কা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বৈরামের কিন্তু আর যাওয়া হইল না, পথে একজন আফগানের ছুরিকাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। কথিত আছে, তাহার পিতা বৈরামের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। আকবর বৈরামখাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। •

১৫৬০-১৫৬২ খৃষ্টাব্দ—এই দুই বৎসর কাল আকবরের জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এসময়ে তিনি অন্তঃপুরের বিলাস প্রমোদের মধ্যে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, রাজকার্য্যের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ—এসময়টার নাম দিয়াছিলেন [Petticoat Government—1560-1562] এবং ঐসময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The Young monarch,as his biographer repeatedly observes, remained behind the veil, and seemed to care for

nothing but sport. He manifested no interest in the affairs of his kingdom, which he left to be mismanaged by unscrupulous women, aided by Adam Khan Pir Muhammad and other men equally devoid of scruple.

এই দুর্ব্বলতা আকবরের চরিত্রে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আপনার অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে মনোযোগী হইলেন।

অতি তরুণ বয়সেই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, এই দেশ কেবল মাত্র মুসলমানদিগকে লইয়া চলিতে পারে না। যদি দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে সাম্রাজ্য শাসন করিতে হয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে উচ্চতম আদর্শে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য সাধন ব্যতীত তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না। আকবর এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এক মহামিলনের ক্ষেত্র রচনা করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে ব্রতী হইলেন। তিনি উদার ধর্ম্ম-মত এবং ন্যায়পরায়ণতা সহকারে

রাজ্য শাসনে ব্রতী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়পরায়ণ এবং সদাশয় শাসনকর্ত্তারূপে তাঁহার সুযশ সুপ্রসারিত হইয়াছিল। একবার সে অনেক দিন পরে তাঁহার পুত্র সেলিম এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে জীবদ্দশায় গায়ের চামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আকবর সেই আদেশের বিষয় যখন জানিতে পারিলেন তখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুত্র হইয়া সেলিম কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিল!"

আকবরের সাম্রাজ্য গঠন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক একজন তরুণ যুবক দিল্লীর সিংহাসনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া যখন চারিদিকে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই যুবকের বিরুদ্ধে নানাস্থান হইতে বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছিল। আকবর ঐশ্বর্য্য, বিলাস, অর্থ এবং আত্ম-ক্ষমতা বিস্তারের জন্য শৈশব হইতেই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে ভারতবর্ষ বিবিধ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ। বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া তিনি এক সুবিশাল সুশাসিত

বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। প্রথমে তিনি দিল্লীর নিকটে যে সকল মুসলমান রাজারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দমন করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন করিলেন। তারপর রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমতঃ আকবর খণ্ড রাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন রাজপুত জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। আকবরের সময়ে চিতোরের* রাণা ছিলেন উদয় সিংহ। উদয়সিংহ সংগ্রাম সিংহের পুত্র। এই সংগ্রামসিংহ বাবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উদয় সিংহ তাঁহার মত সাহসী ছিলেন না। আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করিলেন, তখন উদয়সিংহ নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাজা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু রাজপুত নরনারীগণ পরাজয় স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে জয়মল্ল, তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র পুত্ত, তাঁহার মাতা কর্ম্মদেবী, ভগিনী কর্ণবতী এবং পুত্রের পত্নী কমলাবতী

রাজপুত জাতির সহিত যুদ্ধ

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে আকবর নিজে এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছিলেন। রাজপুত পক্ষের সেনাপতি জয়মল্লকে আকবর নিজ হস্তে গুলি মারিয়া বধ করিয়াছিলেন। জয়মল্লের মৃত্যুর পর রাজপুতগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন, অবশেষে রাজপুত বীরেরা পত্নী ও দুহিতাগণের মান ও সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত "জহর ব্রতের" ব্যবস্থা করিয়া দিয়া একে একে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধের পর আকবর চিতোরে প্রবেশ করিয়া ত্রিশ হাজার রাজপুতকে হীন বর্ব্বরের মত হত্যা করেন,—বীরত্বের সম্মান দেখাইলেন না। আকবর চিতোর-জয় করিয়া অন্যান্য রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই কালিঞ্জর, বুন্দেল খণ্ড প্রভৃতি আকবরের অধিকারভুক্ত হইল। উদয়সিংহ যখন দেখিলেন চিতোর রক্ষা হইল না, তখন তিনি উদয়পুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ সিংহাসনে বসিলেন। প্রতাপ আকবরের অধীনতা মানিলেন না। প্রতাপের ন্যায় স্বদেশবৎসল তেজস্বী মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্প দেখা যায়। আকবর প্রতাপকে পরাজিত করিবার জন্য তাঁহার প্রধান

রাণা প্রতাপ ও হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ

সেনাপতি অম্বরের রাজা মানসিংহ ও মহবৎখাঁকে বহুসৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। হল্‌দিঘাট নামক পার্ব্বত্য পথে দুইপক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ ও রাজপুত সৈন্যেরা অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপেই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। চৌদ্দ হাজার রাজপুত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপের জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। শুধু তাঁহার এক প্রভুভক্ত সর্দ্দারের আত্মত্যাগে প্রতাপের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। প্রতাপ যেখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহার দুই পার্শ্বে তাঁহার রাজছত্র ও পতাকা ছিল; মুঘল সৈনিকেরা সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। মান্না নামে এক সর্দ্দার প্রতাপের জীবন রক্ষার জন্য প্রতাপকে সেখান হইতে সরাইয়া দিয়া নিজে সেই ছত্রতলে দাঁড়াইলেন। মুঘলেরা প্রতাপ মনে করিয়া তাহাকেই বধ করিল। প্রতাপ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং বনে ও পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া অনিদ্রায় অনাহারে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া কোনরূপে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন।



রাণী বিপুল বিক্রমে শত্রু-সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।

মুঘল ভারত, পৃঃ ৬৩

এইরূপে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও প্রতাপ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। অবশেষে ভামসা নামক একজন মন্ত্রীর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চিতোর ভিন্ন তাঁহার সমস্ত রাজ্য মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া, তিনি মনের কষ্টে তৃণ-শয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিতেন না, বৃক্ষ-পত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে আহার করিতেন না।

রাণী দুর্গাবতী

এখানে একজন বীরাঙ্গনার কথা বলিব। তৎকালে রাণী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী গড়মণ্ডলের রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য আকবর সেনাপতি আসফখাঁকে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাবতী তেজস্বিনী বীরনারী ছিলেন। আসফখাঁ গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রু সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। মুঘল সৈন্যেরা এই বীরমহিলার অসাধারণ বীর্য্যবত্তার কাছে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এমন সময়ে দৈবক্রমে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরে দুর্গাবতীর এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তিনি যখন দেখিলেন যে

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব তখন আত্মহত্যা করিলেন, তথাপি শত্রুহস্তে বন্দিনী হইলেন না। আসফখাঁ দুর্গাবতীর মৃত্যুতে অতি সহজেই গড়মণ্ডল হস্তগত করিলেন। কথিত আছে তিনি পূর্ণ একশত কলস স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। আসফখাঁ এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; ইহার ফলে আকবরের সহিত আসফখাঁর কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল।

চাঁদ সুলতানা

চাঁদসুলতানা নামে আর একজন তেজস্বিনী মহিলার সহিতও আকবর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চাঁদসুলতানা ছিলেন আমেদনগরের নাবালক সুলতানের অভিভাবিকা। আমেদনগর জয় করিবার জন্য আকবরের পুত্র মুরাদ তাঁহার প্রধান সেনাপতি খান্‌খানানের অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্যদ্বারা আমেদনগর অবরোধ করেন। চাঁদসুলতানা যেরূপে আমেদনগরের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মুঘল সৈন্যের দ্বারা আমেদনগরের দুর্গের একদিককার প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইলে পর দুর্গের ভিতরের বড় বড় সেনাপতিরা পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এমন সময় বর্ম্মপরিহিতা চাঁদবিবি তরবারি হস্তে প্রাচীর মুখে দাঁড়াইয়া নিজে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে গোলাগুলি ফুরাইয়া গেলে চাঁদবিবি তাঁহার বন্দুকে ও কামানে তামা, রূপা ও সোণার মোহর পুরিয়া নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে মণি-রত্নাদি নিক্ষেপ করিবার সময় আসিলে তবে সন্ধি স্থাপন করেন। চাঁদবিবির অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া মুরাদ তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

গুজরাট-বিজয়

চিতোর জয়ের পর আকবর গুজরাট জয় করেন। হুমায়ুন একবার সাময়িক ভাবে গুজরাট জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শেরশাহকে দমন করিতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে ঐ সুযোগ গ্রহণ করিয়া গুজরাট পুনরায় স্বাধীন হইয়াছিল। আকবর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। তিনি একবসৎর পর ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদয় গুজরাট প্রদেশ অধিকার করেন। গুজরাট বিজিত হইলে পর মুঘল-রাজ্য পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

—*—

বাঙ্গালাদেশে অভিযান।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বঙ্গ-বিজয় করেন। এই সময়ে দাউদ খাঁ বাঙ্গালার রাজত্ব করিতেছিলেন। দাউদ খাঁ বাঙ্গালার সুলেমান কর্‌রাণীর পুত্র। সুলেমান কর্‌রাণী আত্যন্ত সাহসী এবং পরাক্রমশালী সুলতান ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে উড়িষ্যা বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। উড়িষ্যার রাজারাও খুব সাহসী ছিলেন। তাঁহারা বহুবার বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সুলেমানের কালাপাহাড় নামে একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই তিনি উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুলেমান্ কর্‌রাণী আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া বেশ শান্তি-সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু দাউদ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে আকবর স্বয়ং বঙ্গদেশে অভিযান করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। আকবরের সেনাপতি মুনিমখাঁ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দাউদ আবার বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু এইবার রাজমহলের নিকট সম্পূর্ণরূপে

পরাজিত এবং নিহত হইলেন [১৫৭৬ খ্রীঃ]। বাঙ্গালাদেশ হইতে স্বাধীন পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হইল।

রাজ্য বিস্তার

আকবর এই ভাবে একে একে কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, উড়িষ্যা, বেলুচিস্তান এবং কান্ধাহার প্রভৃতি জয় করেন। এইরূপে উত্তর ভারত এবং কাবুল, কান্দাহার, গজ্‌নী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যের আমেদনগর ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অধিকারে আসিল। কিন্তু এ সময় তিনি আমেদনগরের উত্তরাংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চাঁদসুলতানা, আমেদনগরবাসীর ষড়যন্ত্রে হত হওয়ায় আমেদনগর অধিকার করিবার পক্ষে তাঁহার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমেদনগরের বাকী অংশ অনেক দিন পরে আকবরের পৌত্র শাহজাহানের সময় মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল।

আকবরের রাষ্ট্রনীতি

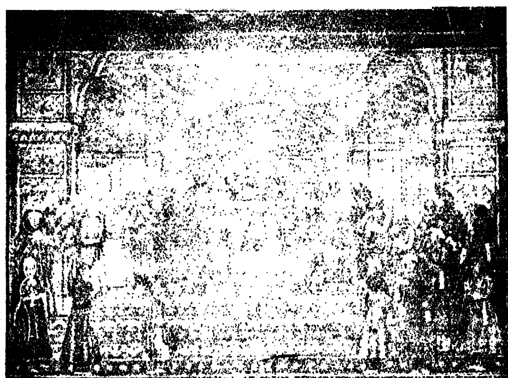
আকবর সাহসী ও বিজয়ী বীর ছিলেন বলিয়াই যে আজও তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে তাহা নহে, তিনি রাজ্যে শান্তিস্থাপন এবং হিন্দু মুসলমানের

মিলনের জন্য যে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন সেই জন্যই তাঁহার এত প্রশংসা। আকবর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যাহাতে বিবাহ হয় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে আকবরই হিন্দু রমণীদিগকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা হিন্দুপত্নী হইয়াছিলেন জয়পুরাধিপতি বিহারীমল্লের কন্যা, আর এক হিন্দুপত্নী ছিলেন, যোধপুরাধিপতির কন্যা। যোধপুরী বেগমের পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরের সহিত তিনি দুইটী রাজপুত কুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর এইরূপ কুটুম্বিতাসূত্রে এবং উদার আচরণে অনেক রাজপুত নৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। সে সময়ে মুসলমান ভিন্ন প্রত্যেক জাতিরই জিজিয়া নামে একটী কর দিতে হইত, হিন্দুদের প্রাণে ইহাতে বড়ই আঘাত লাগিত। আকবর জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। আকবর আপনার অসাধারণ শক্তিতে ও সৌহার্দ্দ্য সূত্রে ভারতবর্ষের বহু রাজ্য জয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শাসনকার্য্য সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ শৃঙ্খলাবিধান



রাণা প্রতাপ সিংহ



আকবরের রাজসভা

পৃঃ ৬৮

করিয়াছিলেন। আকবর শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার অধিকৃত সাম্রাজ্য পনেরটি সুবায় বিভক্ত করেন, যথা—কাবুল, লাহোর—কাশ্মীরও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, মুলতান.—সিন্ধুপ্রদেশ সহ—দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, আহম্মদাবাদ গুজরাট, মালব, বিহার, বাঙ্গালা (উড়িষ্যাসহ), খান্দেশ, বেরার এবং আহম্মদনগর। সুবা ভাগ করিয়া আবার বহু সরকার এবং সরকার ভাগ করিয়া অনেক পরগণা করিয়াছিলেন। সুবাদারগণ তাঁহাদের সুবায় সম্রাটের ন্যায় দরবার করিতেন এবং স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ সুবা শাসন করিতেন। সুবাদারের অধীনে রাজস্ব আদায়ের জন্য এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিতেন। তাঁহারা 'আমলগুজার' নামে অভিহিত হইতেন। বিচারের জন্য কাজী নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজারা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট হারে নিয়মানুযায়ী কর দিতে পারে সেজন্য তিনি মহারাজা টোডর মল্লকে দিয়া রাজ্যের সমস্ত জমির পরিমাপ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আকবর শেরসাহের রাজস্ব নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশ রাজকর ধার্য্য হইত। প্রজারা ইচ্ছা করিলে অর্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা রাজকর দিতে পারিত।

আকবর গুণী ব্যক্তির অত্যন্ত আদর করিতেন। তাঁহার যে সকল মন্ত্রী বা হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুভক্ত, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রাজা টোডর মল্ল জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি হিসাবাদি কার্য্যে অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাটের আদেশে ইনি জরিপ ও রাজস্বের সুনিয়ম করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে যখন পাঠানেরা বিদ্রোহী হয়, তখন টোডর মল্ল বাঙ্গালাদেশে যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। ফৈজী ও আবুল ফজল নামে দুই ভাই ছিলেন। আকবর এই দুই ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ফৈজী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল আকবর নামা ও আইনি আকবরী নামে আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। বীরবল আকবরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। তাঁহার কথায় লোক না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। আকবর ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আফগানিস্থানে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি আকবরকে নানা যুদ্ধে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন।

মানসিংহ অনেক প্রদেশের সুবাদারের কার্য্য করিয়া আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তানসেন—এমন সুবিখ্যাত গায়ক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত

ধর্ম্মসম্বন্ধে আকবর অত্যন্ত উদার ছিলেন। কোন ধর্ম্মের প্রতিই তিনি বিদ্বেষ করিতেন না। আকবর এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর এবং সকল জাতির লোকের কেন্দ্রস্থান ছিল। নানা দেশের সমাজ, জাঁতি ও ইতিহাসের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে আকবর অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শুনিতে ভাল বাসিতেন। আকবর নিজে এক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের নাম—তৌহিদ-ই-ইলাহি। এই ধর্ম্মের মূলসূত্র নিম্নোদ্ধৃত কবিতাতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"The Lord To me the kingdom gave
He made me wise, and strong, and brave,

He girdeth me in right and truth.
Filling my mind with love of truth,
No praise man can sum his state,
Allahu Akbar! God is Great,"

আকবরের রাজনীতি অতি ন্যায়ানুমোদিত ছিল। আমরা এখানে আকবরের নিজের উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "অসত্যাচরণ সকলের পক্ষে গর্হিত, বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অতিশয় গর্হিত। এই সকল লোককে ঈশ্বরের ছায়া বলে, ছায়া সরল থাকিবে। চারিটি কার্য্য হইতে রাজা নিবৃত্ত থাকিবেন,—মৃগয়া, নিরন্তর ক্রীড়ামোদ, দিবারজনী মত্ততা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতা।"

সমাজ-সংস্কার

আকবরের দৃষ্টি সর্ব্বদিকে সমান ভাবে নিবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের সামাজিক সংস্কারের দিকেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। নিম্নলিখিত সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন—[১] সহমরণ নিবারণ, [২] ঘনিষ্ঠ স্বগণের পরিবর্ত্তে দূরতর সম্পর্কে বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। [৩] বিধবা

বিবাহ প্রচলনের জন্যও তিনি বিধি প্রচার করেন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মের নামে পশু হত্যা করা যে গুরুতর অন্যায় তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল সামাজিক সংস্কারের জন্য কোনরূপ কঠোর বিধি প্রবর্ত্তন করেন নাই, দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা প্রজাসাধারণকে ঐরূপ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আকবর সাহিত্য, ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে বিবিধ সংস্কার করিয়া যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তেমনি রাজস্ব সম্পর্কিত বিবিধ সংস্কার দ্বারা ভারতবর্ষের এক অসাধারণ কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন।

রাজস্বনীতি ও সামরিক নীতি

তিনি প্রথমতঃ সমস্ত ভূমিই পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিঘায় কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তদ্বিষয় নির্দ্ধারণ করেন। এজন্য তিনি সর্ব্বস্থানের জন্য একজাতীয় নলের সৃষ্টি করেন। এবং উর্ব্বরতা অনুসারে ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

আকবরের সামরিক বিধি ব্যবস্থাও নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন। এমন কি সিপাহ-শালার—সুবাদার, নবাব প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুর্চ্চিখানার প্রধান কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন

সামরিক নীতি

কেহ চারি হাজারের, কেহ দশহাজারের মনসবদার হইতেন এই সকল মনসবদারদের এবং উচ্চপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ বিজয় করেন। এই যুদ্ধে আবুল ফজল অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

খান্দেশ বিজয়

দুর্ভেদ্য আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া আবুল ফজল বিশেষ যশো লাভ করেন। এই বৎসরই আবুল ফজল সম্রাটের আদেশে দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে ফিরিবার সময় রাজ-কুমার সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। আকবর প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুতে এতদূর শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি অন্নজলও গ্রহণ করেন নাই।

খান্দেশ জয়ের চারি বৎসর পরে সাহজাদা দানিয়ালের মৃত্যু হয়। সম্রাট দানিয়ালকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

এই নিদারুণ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সে সময়ের ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিমআলী এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ ভিষকগণ বাদসাহের পীড়া আরোগ্য হওয়া অসম্ভব মনে করিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে বাদসাহের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বাদসাহ যখন পীড়িত ছিলেন, তখন সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন সচিব-শ্রেষ্ঠ খান-ই-আদম। রাজা মানসিংহ আকবর শাহের একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি মুঘল দরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু, মানসিংহের ভাগিনেয় এবং খান-ই-আদমের জামাতা। তাঁহারা খুসরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও এ সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত ওমরাহগণকে তাঁহার শয়ন কক্ষে আসিবার জন্য সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। সেলিম ওমরাহগণকে লইয়া শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলে পর সকলের নিকট

ক্রোধবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাহিলেন। সেলিম বাদসাহের পদতলে পড়িয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাদসাহ ইঙ্গিত করিয়া সেলিমকে তাঁহার তরবারি গ্রহণ করিতে বলিলেন। তৎপর সম্রাটের আদেশে সেলিম রাজান্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তাঁহার পুরাতন বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি উদার সম্মানজনক ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আকবর সেলিমকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া চিরদিনের জন্য পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ সাহেব আকবর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"জাতির কল্যাণের জন্য বিধাতা যে সকল মহাপুরুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া কোটি কোটি নর-নারীর সুখ ও শান্তির বিধান করিয়া থাকেন আকবরও সেইরূপ একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহামনীষী ব্যক্তি ছিলেন—একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

আগ্রার কিছুদূরে ফতেপুর সিক্রী নামক স্থানে আকবর এক নূতন সহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনেক সময় আকবর সেখানে থাকিতেন। আজও সেখানকার লালপাথরের গড়া সুন্দর সুন্দর বাড়ী গুলি তাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। আকবর পঞ্চাশ বৎসর

কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল।

আকবর দেখিতে মধ্যমাকৃতি ছিলেন, উচ্চতায় পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চির বেশী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার দেহ সুগঠিত এবং বেশ শক্তিশালী ছিল। তাঁহার গায়ের রং খুব ফর্শা ছিল না। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। প্রত্যেকটি ব্যবহারে—সব বিষয় তাঁহার রাজোচিত গুণ ফুটিয়া বাহির হইত। একদিকে যেমন তিনি দয়াদ্র হৃদয় ছিলেন, তেমনি সময় সময় অত্যন্ত কঠোর হইতেও জানিতেন। ন্যায়বিচার তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার খুব বেশি, শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ফতেপুর সিক্রী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেকেন্দ্রায় তাঁহার সমাধি-মন্দির মুঘল স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আকবরের শাসন কালে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার সূত্রপাত করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ নরপতি ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতের বিবিধ কল্যাণ হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর বা পৃথিবী-জয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারতের সম্রাট্ হইলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা খসরুর বিদ্রোহাচরণ। জাহাঙ্গীর স্বীয় আত্মচরিতে এই বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে খসরুকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে কিরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হইয়াছিল। হাসান বেগ ও আবদুল রহিম নামক দুইজন ওমরাহ খসরুর একান্ত অনুরাগী ও প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাদিগকে বৃষের চর্ম্মের মধ্যে ও গর্দ্দভের চর্ম্ম-মধ্যে পুরিয়া গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন।

খসরুর বিদ্রোহ ও পরিণাম

হাসানবেগ এই অবস্থায় নিঃশ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু আবদুল রহিম বন্ধুগণের সাহায্যে মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ইহার পর রাজপথের উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল সকল প্রোথিত করিয়া খস্রুর তিনশত অনুচরকে তদুপরি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। খস্রুকে প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখান



জাহাঙ্গীর

মুঘল ভারত, পৃ ৭৮

হইত। কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর পিতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করেন। কিন্তু পুনরায় খস্রু বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার আদেশ প্রদান করেন। সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইলে পর জাহাঙ্গীর খস্রুর যন্ত্রণা ও অনুতাপ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চিকিৎসার গুণে রাজকুমার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করায় জাহাঙ্গীর প্রীত হইয়া চক্ষু চিকিৎসককে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—বর্দ্ধমানের জায়গীরদার সের আফগানের হস্তে বাঙ্গালার সুবাদার কুতবউদ্দীন ও কুতবউদ্দীনের অনুচরগণের হস্তে শের আফগানের মৃত্যু। এ বিষয়ের সহিত একটী সুন্দর প্রণয় কাহিনী যুক্ত রহিয়াছে। জাহাঙ্গীর শের আফগানের পত্নী মেহেরুন্নেসাকে ভালবাসিতেন কাজেই শের আফগান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর বাদশাহ তাঁহার পত্নী মেহেরুন্নেসাকে বিবাহ করিবেন। এই ঘটনার ইতিহাস এইরূপ। মেহেরুন্নেসা পারস্য দেশের এক বণিকের কন্যা, ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল মেহেরউন্নিসা। ইঁহার পিতা দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর যৌবনকালে অন্তঃপুরের মধ্যে এই পরমাসুন্দরী বালিকাকে দেখিতে পাইয়া ভালবাসিয়াছিলেন। সেলিম মেহেরউন্নিসার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন; কিন্তু শেরআফ্গান্ নামক একজন যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা পূর্ব্বেই স্থির হওয়ায় শেরআফ্গানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া কৌশল করিয়া শেরআফ্গান্‌কে বধ করিয়া মেহেরউন্নিসাকে আগ্রায় আনিয়া বিবাহ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই বিবাহ হয়। শেরআফ্গানের হত্যাব্যাপারে জাহাঙ্গীর দোষী ছিলেন কি নির্দ্দোষী ছিলেন ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক আছে।

বিবাহের অল্প দিন পরেই মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীরের প্রধানা ও প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমতঃ নূরজাহান [The light of the palace] এবং তাহার পর অল্পদিনের মধ্যেই [The queen, the light of the world] জগতের আলো উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। নূরজাহানের যেমন ছিল সৌন্দর্য্য, তেমন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। কিছুকালের মধ্যেই তিনি জাহাঙ্গীরের উপর অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। নূরজাহান রাজকীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সর্ব্ববিধ সম্মান বিতরণের ভার

তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি স্বাধীন নৃপতির ন্যায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার নিজ নামে খোতবা পাঠ হইত না। তাঁহার নাম-সংযুক্ত রাজমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। সনন্দের রাজকীয় মোহরও তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইত। বাদশাহ নূরজাহানের হাতের পুতুল হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—রাজকার্য্য পরিচালনায় নূরজাহানই যোগ্য ব্যক্তি। কেবল এক বোতল মদ এবং এক টুকরা মাংসই আমার নিজের সন্তোষ বিধানের পক্ষে যথেষ্ট।" নূরজাহান অশেষ গুণশালিনী ছিলেন বলিয়া সকলের প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি দানশীলা এবং পরোপকারী ছিলেন। অনেক নিরুপায়া বালিকা তাঁহার অর্থ সাহায্যে বিবাহিতা হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর পিতার প্রবর্ত্তিত রাজনীতি অনুসারে রাজ্য-শাসন করিতেন। এসময়ে যে সকল রাজকর্ম্মচারী নিজ নিজ ক্ষমতার দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ, আসফখাঁ প্রভৃতি প্রধান। গিয়াসবেগ নূরজাহানের পিতা, নূরজাহানের সাহায্যে তিনি উজিরী পদ লাভ করিয়াছিলেন। আসফখাঁ নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার উন্নতির মূলেও নূরজাহানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আসফখাঁ রাজনীতিজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি

ছিলেন। মহবত খাঁ ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি। ইনি জাতিতে পাঠান ছিলেন। মহবত খাঁ বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজকুমার খুরম বাদশাহের তৃতীয় পুত্র, বীর ও তেজস্বী বলিয়া সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইয়োরোপীয় বণিকগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এগার মাস কাল সমুদ্র-পথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কালিকাট নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অতঃপর ইয়োরোপীয় আরও অনেক জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান উইলিয়াম হকিনস্ হেক্টার নামক জাহাজে চড়িয়া সুরাট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের সর্ত্ত সম্বন্ধে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সুবিধাজনক সর্ত্তের ব্যবস্থার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। হকিন্স একজন তুর্কি দ্বিভাষীর সাহায্যে সম্রাটের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। এবং জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি মুঘল দরবারের একটা ইতিহাসও লিখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীর হকিন্সের সমুদয় প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তিনি হকিন্সকে

বার্ষিক ত্রিশহাজার টাকা বেতনে ৪০০ শত সৈন্যের অধ্যক্ষ মনসবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের পর মুঘলসাম্রাজ্যের অধিপতি হইবার জন্য শাহজাহানের মনে মনে একান্ত ইচ্ছা ছিল। নূরজাহান ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। খসরু বন্দীভাবে ছিলেন, দক্ষিণাপথের তৃতীয় যুদ্ধকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্র পরভেজকে বাদশাহ ভালবাসিতেন না। পরভেজ নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার প্রাণে কোনরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কাজেই শাহজাহানের সিংহাসন লাভের আশা সফল হওয়ার পক্ষে যে যথেষ্ট সুযোগ ছিল তাহা না বলিলেও চলে। নূরজাহান শাহজাহানকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। নূরজাহানের—শেরআফগানের ঔরসজাত এক কন্যা ছিল, জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শাহরিয়ার, নূরজাহানের বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন, নূরজাহানের কথা অনুসারে চলিতেন, কাজেই শাহরিয়ার জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করিলে নূরজাহানের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া নূরজাহান শাহরিয়ারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য নূরজাহান শাহজাহানকে সর্ব্বদা রাজধানী হইতে দূরে দূরে

রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কান্দাহার—মুঘলদের হস্তচ্যুত হইলে, পারস্যাধিপতির হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করিবারজন্য নূরজাহান চক্রান্ত ও কৌশল করিয়া শাহ-জাহানকে উক্তদেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শাহজাহান এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া সম্রাটের আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে নূরজাহান সুযোগ পাইয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন।

শাহজাহান এই অপমান ভাল ভাবে গ্রহণ করিলেন না, তিনি বিদ্রোহ করিলেন এবং সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বাদশাহী ফৌজের সহিত শাহজাহানের যুদ্ধ হইল। শাহজাহান পরাজিত হইলেন এবং দাক্ষিণাত্যের দিকে পলায়ন করিলেন। বাদশাহের অপর পুত্র পরভেজ এবং সেনাপতি মহবৎখাঁ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দাক্ষিণাত্যের কোনও রাজা শাহজাহানকে সাহায্য করিলেন না, নিরুপায় হইয়া শাহজাহান বঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন। সে সময়ে এব্রাহিম ফতে খাঁ নামে নূরজাহানের এক ভ্রাতা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি শাহজাহানকে আক্রমণ করিলেন

কিন্তু শাহজাহানের নিকট পরাজিত হইলেন। ফতেখাঁরও যুদ্ধে মৃত্যু হইল। অতঃপর শাহজাহান বিহারের দিকে যাত্রা করিলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তারা শাহজাহানের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করায় বিহার অতি সহজেই শাহজাহানের হস্তগত হইল। শাহজাহান বিহারের শাসন-ব্যবস্থা করিয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। এলাহাবাদের নিকট হুসি নামক স্থানে রাজকুমার পরভেজ এবং সেনাপতি মহবৎখাঁর সহিত শাহজাহানের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং নিরুপায় হইয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যের দিকে গমন করিলেন। সেখানে মুঘলের পরম শত্রু মালিক আম্বেরের সহিত—শাহজাহান যোগদান করিলেন। বাদশাহ পুত্র শাহজাহানের পরাজয় সংবাদ জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহবৎখাঁকে বঙ্গদেশের সুবেদারী পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার প্রতি এই আদেশ প্রেরণ করিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত শাহজাহান সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত না হইবেন ততদিন যেন মহবৎখাঁ শাহজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিরস্ত না হন এবং সেই সময়ে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা বাংলা দেশ শাসন করিবেন।

বাদশাহ মহবৎখাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইতেছিলেন কিছুকাল পরেই তাহাঁর পরিবর্ত্তন হইল। ইহার কারণ যে নূরজাহান, সে কথা না বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার কন্যার জামাতা বাদশাহের অন্যতম পুত্র শাহরিয়ার সিংহাসন লাভ করেন তাহাই ছিল নূরজাহানের ইচ্ছা। নূরজাহানের এই মতের মহবৎখাঁ ছিলেন প্রধান বিরোধী, কাজেই নূরজাহান ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই মহবৎখাঁকে সম্রাটের চক্ষে হীন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহারা মহবৎখাঁকে রাজদ্রোহী এবং রাজস্ব অপহরণকারী বলিয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মহবৎখাঁর সহিত শাহজাহানের যখন যুদ্ধ হয় তখন বহু হস্তী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, মহবৎখাঁ তাহা বাদশাহের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করেন নাই। জাহাঙ্গীর অভিযোগের বিবরণ বিশ্বাস করিলেন এবং মহবৎখাঁকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ কাবুলে যাইতেছিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত ছিল। মহবৎখাঁ সম্রাটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে দেখা করিতে পারিলেন না। তখন

তিনি বাদশাহকে বলপূর্ব্বক হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন কাবুলের পথে ঝিলাম নদী পার হইতেছিলেন তখন মহবৎ অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে সম্রাটকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বাদশাহকে বন্দী করিলেও তাঁহার সম্মান এবং মর্য্যাদা এবং আরামপ্রিয়তার দিক দিয়া কোনওরূপ ত্রুটী যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার বিলাস ও আরামের কোনও ত্রুটী হইতেছেনা দেখিয়া সন্তুষ্টই ছিলেন। নূরজাহান স্বামীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থ হইলেন তখন নিজেও বাদশাহের সহিত বন্দিনী হইলেন। এই সময়ে মহবৎখাঁ সম্পূর্ণরূপে জাহাঙ্গীরকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন কি তিনি মহবৎখাঁর অভিযোগ অনুযায়ী বেগমের প্রাণদণ্ডের জন্য আদেশ পত্র স্বাক্ষর করিলেন। কথাটা যখন নূরজাহান শুনিলেন তখন তিনি বলিলেন, "একবার আমাকে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে দাও এবং তিনি যে হস্তে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই হস্ত অশ্রুসিক্ত করিতে দাও।" মহবৎখাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান বাদশাহের

নিকট আনীতা হইলেন। মানসিক যন্ত্রণায় নূরজাহানের সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হইলেন, তিনি করুণ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, "মহবৎ, তুমি কি এই নারীর জীবনরক্ষা করিবে না? দেখ, নূরজাহান কিরূপ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে!" মহবৎ বলিলেন, "আপনার আদেশ অপূর্ণ রহিবেনা। নূরজাহান প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন।" ইহার পর নূরজাহান অতি সুন্দর কৌশলের সহিত নিজেও মুক্ত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটেরও মুক্তি সাধন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর মহবৎখাঁর এই দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহী শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ করায় তাঁহার দমনের জন্য মহবৎখাঁকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। মহবৎখাঁ দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পরভেজ অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া পরলোকগমন করিলেন। এদিকে শাহজাহানও পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। মহবৎখাঁ ও শাহজাহানের মিলনের পর সম্রাট অতি অল্পদিনই বাঁচিয়াছিলেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শ্বাস কাশের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিল। এই সময়ে জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে যাইতে-

ছিলেন। একদিন পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিয়াও রোগের উপশম করিতে পারিলেন না। ঊনষষ্ঠিতম বর্ষে বিলাসী জাহাঙ্গীর চিরদিনের জন্য নয়ন মুদিত করিলেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ ছিল কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানে ঐ সকল গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতাও যেমন ছিল আবার তেমনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ছবি আঁকিতে ও কবিতা লিখিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জাহাঙ্গীর নিজের একখানা জীবন-চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জীবন-চরিতে তাঁহার রাজত্বের উনিশ বৎসর কালের বিস্তৃত পরিচয় আছে। ঐ জীবন-চরিতখানা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি।

জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সুশাসনের জন্য দ্বাদশটী অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুশাসন-গুলির মধ্যে রাজ্যশাসন সম্পর্কে যে সকল বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল তজ্জন্য তিনি উত্তরকালে একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, রাজনীতিবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর এক মুহূর্তের জন্য সুরাপাত্র

হস্তচ্যুত করিতেন না তিনি অনুশাসনে এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ মদ অথবা, অন্য কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে রাজ্যের মধ্যে প্রজার চরিত্র সংগঠনের জন্য কিরূপ খরদৃষ্টি তাঁহার ছিল। জাহাঙ্গীর ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন বলিয়া আজও তাঁহার নাম গৌরবের সহিত পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মচরিতে একস্থানে গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—"God forbid that in such affairs I should consider princes, and far less that I should consider Amirs."



শাহজাহান

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের যখন মৃত্যু হইল, তখন শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। এই সুযোগে নূরজাহান তাঁহার জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু নূরজাহান তাঁহার ভ্রাতা আসফখাঁর ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আসফখাঁ প্রথম অবস্থায় নূরজাহানের পক্ষাবলম্বন



শাহজাহান



করিলেও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানকে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহজাহানের দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইতে পারে এবং সেই অবসরে রাজ্য মধ্যে অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে এইজন্য আসফখাঁ খসরুর পুত্র দাওয়ারবক্সকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে শাহজাহান যখন নিরাপদে দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন দাওয়ারবক্স নিহত হইল এবং শাহজাহান সিংহাসনে বসিলেন।

দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের মধ্যে শাহজাহান যেমন শান্তি ও সুখের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, অতি কম সম্রাটের পক্ষেই সেইরূপ সৌভাগ্যের কারণ ঘটিয়াছে।—শাহজাহানের জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আসিয়াছে দিল্লীর বাদশাহদের অনেকের জীবনেই তদ্রূপ হয় নাই।

আসফখাঁর জীবনের উন্নতির মূলে নূরজাহানের হাত কতখানি ছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তবে আসফখাঁ নূরজাহানকে পরিত্যাগ করিয়া কেন শাহজাহানকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করিলেন তাহার ইতিহাসটুকু

বাস্তবিকই কৌতূহলজনক। শাহজাহান আসফখাঁর কন্যা আরজমন্দবানুকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে মূলের প্রণয় ইতিহাসটুকু বড় সুন্দর। মুঘল রাজত্বকালে —বাদশাহের অন্তঃপুরে বৎসরে একবার এক মেলা বসিত, তাহার নাম ছিল খোস্‌রোজ—অর্থাৎ আনন্দের দিন। এই মেলায় রূপসী ললনাদের বাজার মিলিত। একবার এই মেলায় আরজমন্দবানু উপস্থিত ছিলেন। শাহজাহান এক খোসরোজের মেলায় আরজমন্দবানু বেগমকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া অভিভূত হইলেন এবং সেই অলোকসাধারণ রূপসীর নিকট হইতে একখণ্ড মিশ্রী বহু অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিলেন। ঐ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন প্রাণও সুন্দরীর চরণ তলে বিকাইয়া দিলেন। এই কথাটা গোপন রহিল না। আরজমন্দবানুর স্বামীর কাণে যখন কথাটা পঁহুছিল, তখন তিনি নানাদিক চিন্তা করিয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন। শাহজাহান মহাসমারোহে আরজমন্দবানুকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সিংহাসন লাভ করিবার পর বানুবেগমকে 'মমতাজজেমানী' বা মমতাজমহল অর্থাৎ 'তৎকালের গৌরব' এই উপাধি-ভূষণে ভূষিতা করিয়াছিলেন। যতদিন মমতাজ বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই

মহীয়সী মহিলার আদর, যত্ন ও সেবায় শাহজাহানের জীবন সুখময় হইয়াছিল।

শাহজাহান ছিলেন বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁহার রাজত্বকালে আগ্রা ও দিল্লী বিবিধ সৌধমালায় সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। তিনি বহু সুন্দর নগর এবং সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। দিল্লী ও আগ্রায় যে সকল সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ই শাহজাহান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দেওয়ান আম, দেওয়ানখাস্ ও মতি মসজিদ্ তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দিল্লী শাহজাহান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন শাহজাহানাবাদ। দিল্লীর দুর্গমধ্যে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস অবস্থিত। খাসে বসিয়াই শাহজাহান দরবার করিতেন।

শাহজাহান যে সিংহাসনের উপর বসিয়া বিচার করিতেন, তাহার নাম ছিল ময়ূর-সিংহাসন। পৃথিবীর কোন রাজার এইরূপ মূল্যবান সিংহাসন ছিল না। স্তম্ভের মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত এক এক যোড়া ময়ূর বসান ছিল। প্রত্যেক যোড়া ময়ূরের মাঝখানে এক একটী মণিমাণিক্য দ্বারা গঠিত গাছ ছিল। ইহা এমন

ভাবে গঠিত ছিল, মনে হইত যেন ময়ূর দুইটি ঠোকরাইয়া গাছের ফল খাইতেছে। এই সিংহাসন মূল্যবান্ হীরা, মণি, মুক্তা দ্বারা শোভিত ছিল। কাজেই ইহা নির্ম্মাণে তাঁহার ব্যয় পড়িয়াছিল দশকোটি টাকা। এইরূপ ভাবে তাঁহার রাজমুকুট, সাজপোষাক সমুদয়ই বহু মূল্যবান ছিল। কোন বাদশাহের আমলেই এত জাঁকজমক ছিলনা। শাহজাহানের অমর কীর্ত্তি জগদ্বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল। এমন সুন্দর সমাধি-মন্দির পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

শাহজাহান মমতাজমহলকে কিরূপ ভালবাসিতেন সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কি যুদ্ধ যাত্রায়, কি ভ্রমণে, কি স্থির হইয়া বাসকালে কখনও শাহজাহানকে ছাড়িয়া মমতাজমহল থাকিতেন না। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মমতাজমহল শাহজাহানের সহিত বুহারনপুরে যান, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেবলমাত্র উনচল্লিশবৎসর বয়সে সন্তান প্রসবের সময় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মমতাজের দেহ সাময়িকভাবে বুহারনপুরে সমাধিস্থ করা হয়, ছয়মাস পরে তাঁহার মৃতদেহ আগ্রায় আনিয়া যমুনার তীরে সমাধি দেওয়া হয়। সেই সমাধির উপরে যে সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই তাজমহল



তাজমহল

মুঘল ভারত, পৃঃ ৯২

নামে পরিচিত। নানাদেশ হইতে মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া নানাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আনাইয়া বহু পরিশ্রমে বহুটাকা ব্যয়ে বাইশবৎসর কাল পরিশ্রমের পর এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় আর ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। মমতাজমহলের নাম অনুসারে ইহা তাজমহল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তাজমহলে শ্বেত প্রস্তরের উপর বহু মূল্যবান বিবিধ বর্ণের পাথর দিয়া লতা পাতা এমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, যেন ইহা সত্য সত্যই স্বপ্নের ছবি।

শাহজাহানের শেষ জীবন বড় অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার কঠিন পীড়া হইলে, তাঁহার চারি পুত্র—দারা, সুজা, আওরংজীব ও মোরাদ রাজ্যলাভের জন্য পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া তাহার জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তিন বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরংজীব জয়ী হইয়া বৃদ্ধ শাহজাহানকে বন্দী করিয়া রাখেন। আট বৎসর বন্দী থাকিয়া অবশেষে শাহজাহানের মৃত্যু হয়। শাহজাহানের দেহও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধির পার্শ্বেই সমাহিত করা হইয়াছিল।

শাহজাহানের জীবিত অবস্থায়ই রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত্রগণ যেরূপ শোচনীয় ভাবে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরস্পরের রক্তপাত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আওরংজীবের শঠতা চাতুরী এবং নিষ্ঠুরতা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। আওরংজীব কৌশল করিয়া মুরাদবক্সকে বন্দী করিয়াছিলেন, সুজার সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইলেও বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর শঠতায় মুরাদকেও জিৎবাজী হারিতে হইল। মুরাদ গোয়ালিয়রের কারাগারে বন্দী রহিলেন। আর দারা—দারার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। সিন্ধুদেশে নির্ব্বাসিত অবস্থায় তিনি বাস করিতেছিলেন। নানারূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া দারা অতিকষ্টে গুজরাটে গিয়া সেখানকার শাসনকর্ত্তার সাহায্যে একদল সেনা গঠন করিয়া আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হন। আজমীরের নিকট ঔরংজেব কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে অবশেষে বোলানে গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী দাদর নামক স্থানের নায়ক জিহন খাঁ নামক এক আফগান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে ঔরংজীবের নিকট ধরাইয়া দিলেন। এইখানেই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর অনাহারে ও কষ্টে মৃত্যু হইয়াছিল।

"দারা কারাগারে রাজকুমার সেপেরশোকোর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর আওরংজীবের অনুচরগণ তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি একজন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজককে কারাকক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু এ অনুমতি পাইলেন না। এই দুর্দ্দশার সময় তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের প্রত্যাশী হইলেন। এই সময়ে নাজির নামক এক দুরাত্মা দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। দারার ছিন্নমস্তক আওরংজীবের নিকট নীত হইল। আওরংজীব, উহা যথার্থই দারার মস্তক কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারারুদ্ধ পিতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। বোর্ণিয়ার লিখিয়াছেন—আওরংজীব দারার ছিন্ন মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—"Ah (Ali) Badbakt! A wretched one!

let this Shocking sight no more offend my eyes, but take away the head and let it be buried in Humayon's Tomb [মোগলবংশ ২৬৮ পৃ] বিচারের মিথ্যা অভিনয়ে এই ভাবে মহাপ্রাণ দারাশাকোর জীবন নিঃশেষ হইয়াছিল। মুরাদও বিচারাভিনয়ের কৌশলে জর্জ্জরিত হইয়া আওরংজীবের কঠোর আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

শাহজাহানের বন্দী অবস্থায় আওরংজীব তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্মানজনক ব্যবহার করিতেন। ঐতিহাসিক বোর্ণিয়ার বলেন যে ঐ সময়ে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেন—এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরংজীব সর্ব্ববিষয়েই পিতার মনোরঞ্জন করিতেন। কথিত আছে যে, পিতা পুত্রের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

শাহজাহানের বন্দী অবস্থায় তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা ভক্তিপূর্ণ সেবার দ্বারা পিতার বিষাদ-ক্লিষ্টজীবনে কিয়ৎপরিমাণে শান্তিদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুগের ঐতিহাসিকগণ জাহানারাকে পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাহাজাহান তাঁহাকে আদর করিয়া "পাদশাহ বেগম" উপাধি প্রদান করিয়া-

ছিলেন। কি সংসারিক ব্যাপারে, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণায়, কি সেবা ও যত্নে—সর্ব্ববিষয়েই তিনি পিতার একান্ত হিতৈষিণী ছিলেন। আওরংজীব শাহজাহানকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলে জাহানারাও পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে যে প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া পায় সেখানে জাহানারার ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবরটি অবস্থিত। মধ্যস্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষ দেশে জাহানারার নিজের রচিত একটী কবিতা লিখিত আছে,—

“বহুমূল্য আভরণে করিওনা সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীনা আত্মা জাহানারা
সম্রাট কন্যার।”



আওরংজীব আলমগীর

আওরংজীব 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া আগ্রার সিংহাসনে বসিলেন এবং একে একে ভাইদের পরাজিত এবং নিহত করিলেন। মধ্যম ভ্রাতা সুজা আরাকান রাজ্যে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া সেখানে প্রাণ হারাইলেন। এই ভাবে নিরাপদ হইয়া তিনি সিংহাসনে বসিলেন।

আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রীতি স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যে রীতির অনুসরণ করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, আওরংজীব সে ভাবে রাজ্য শাসনের দিকে মন দিলেন না। তিনি গোড়া মুসলমান ছিলেন, রাজ্য লাভ করিয়াই অনুদার ধর্ম্ম-মতের দিকে মন দিলেন। তাঁহার এইরূপ পরধর্ম্ম-বিদ্বেষই মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। আওরংজীব প্রথমেই হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাইয়া দিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বেশ প্রীতি ও মিলনের ভাব ছিল, সেই ভাবের সহসা এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যে সকল কাজে হিন্দু কর্ম্মচারী ছিল,

তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া সে স্থানে মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। চিতোরের রাণা রাজসিংহ তাঁহার এইরূপ জাতি বিদ্বেষ দেখিয়া বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিল।

আওরংজীব রাণার উপর চটিয়া গেলেন। রাজপুতেরাও আওরংজীবের এত অত্যাচার সহ্য করিলেন না। উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাজপুতদের সহিত কলহ

রাজপুতানার প্রধান প্রধান রাজারাও আসিয়া রাণার সহিত যোগদান করিলেন। আওরংজীব যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, এবং বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা বড় সহজ নহে। অবশেষে বাধ্য হইয়া রাজপুতদের সহিত তাঁহার সন্ধি করিতে হইল। রাজপুতানার রাজারা এই সুযোগে একরূপ স্বাধীন হইয়া গেলেন।

এই সময়ে ধীরে ধীরে আওরংজীবের এক প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্র দেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। আওরংজীব কাহারও সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সে সময়ে বিজাপুর, গৌলকুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটী মুসললান রাজ্য

ছিল। ইহারা ভিন্নশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা করিতেন। যদি তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে হয়ত মারহাট্টারা প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু তাঁহার নিজের ত্রুটীবশতঃই মারহাট্টারা শিবাজীর অধীনে শক্তিশালী ইহয়া উঠিবার সুযোগ পাইল।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া শেষ জীবনে আওরংজীবকে মারহাট্টাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রায় বাইশ বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াও কোন মতেই তাঁহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। এই ভাবে নানা অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার যুদ্ধের কঠোর পরিশ্রমের পর দিল্লী ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরংজীবের চরিত্র

আওরংজীব মুসলমান ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। যুদ্ধের সময় চারিদিক হইতে নানা গোলাগুলি ছুটিয়া আসিতেছে, সেইরূপ সময়েও যেমন নমাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অমনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া নমাজ পড়িতেন।

এদিকে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য রাজকোষের এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। বই নকল করিয়া, টুপী সেলাই করিয়া, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া নিজের খরচ চালাইতেন। তিনি মদ্য স্পর্শও করিতেন না, কোনরূপ ভোগ-বিলাসও ভালবাসিতেন না।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে আওরংজীবের মত ক্ষমতাশালী সম্রাট আপনার সমাধি-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাত্র চারি টাকা দুই আনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মুঘল দরবারে গায়ক, চিত্রকর, প্রভৃতি শিল্পীদের অত্যন্ত সমাদর ছিল। আওরংজীব সে সমুদয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একবার কয়েকজন গায়ক, একটা কৃত্রিম শব প্রস্তুত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আওরংজীবের বাস-গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। আওরংজীব কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মরিয়াছে? তোমরা এত কাঁদিতেছ কেন?" তাহারা বলিল, "সঙ্গীতের মৃত্যু হইয়াছে—আমরা কবর দিতে চলিয়াছি।" আওরংজীব বলিলেন,—"খুব ভাল করিয়া কবর দিও"—যেন আর না উঠিতে পারে।"

আওরংজীবের প্রধান শত্রু ছিলেন শিবাজী। শিবাজীর সহিত তাঁহার কলহ ও যুদ্ধের বিষয় পরে বলিতেছি।

বাঙ্গালা

আওরংজীবের রাজত্বকালেও বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। আওরং-জীব তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুমলাকে বঙ্গদেশের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মীরজুম্‌লা বঙ্গ দেশে আসিবার অব্যবহিত পরেই আসাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বৃষ্টি ও বর্ষার জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। আসামবাসীরা বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। তাঁহাদের আক্রমণে মীরজুম্‌লা বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মড়ক লাগিয়া মীরজুম্‌লার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং মীরজুম্‌লা নিজেও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মীরজুম্‌লার পরে নবাব শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার হইলেন। ঢাকার রাজধানীতে শায়েস্তা খাঁর অনেক কীর্ত্তি আছে। শায়েস্তা খাঁ ত্রিশ বৎসর কাল বাঙ্গালা দেশ শাসন করেন। তাঁহার এই শাসনকালকে সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে।

ইংরাজদের বাণিজ্য বিস্তার

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই ইংরাজেরা বঙ্গদেশে তাঁহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেন। শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা যখন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার

শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সে সময়ে সুবিখ্যাত ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনা দিতে স্বীকৃত হইয়া বিনা মাশুলে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। আওরংজীবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশে ইংরাজদের কুঠিগুলির অবস্থা ভাল ছিল না। সম্রাট্ আওরংজীব কোম্পানীকে বাঙ্গালা দেশে স্থান ক্রয় করিয়া আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেওয়ায়,ও বণিকগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আওরংজীবের পৌত্র আজিমুশ্বানের অনুমতি অনুসারে কলিকাতা, সূতানুটি গোবিন্দপুর এই তিনটী জলা ভূমি ক্রয় করিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশ্বস্ত ভৃত্য জব চার্ণক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে কলিকাতায় নির্ম্মিত দুর্গের নাম ফোর্ট উইলম দেওয়া হইয়াছিল। বাগবাজারের খাল হইতে বড়বাজার পর্য্যন্ত স্থানটিকে সূতানুটি বলিত। বড়বাজার হইতে লাট সাহেবের বর্ত্তমান বাড়ী পর্য্যন্ত স্থানটি কলিকাতা নামে খ্যাত ছিল; লাট সাহেবের বাড়ী হইতে ভবানীপুরের উত্তর পর্য্যন্ত স্থানটীর নাম ছিল গোবিন্দপুর। এই তিন গ্রামের সমষ্টিই বর্ত্তমান কলিকাতা। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মাদ্রাজে এক

কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ইহা রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। মাদ্রাজেই ইংরাজদের প্রধান স্থায়ী কুঠি হইল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ রাজকুমারী ক্যাথারাইনের সহিত ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হয়। এই বিবাহে পর্ত্তুগালের রাজা জামাতাকে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ দান করেন। দ্বিতীয় চার্লস মাত্র দশ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড়শত টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া উহার সমুদয় স্বত্ব কোম্পানীকে অর্পণ করেন। তখন বোম্বাই একটা সামান্য ধীবর পল্লী মাত্র ছিল। চারিদিকে নীল সাগরের চঞ্চল জল; মাঝখানে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটা দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। ইংরাজদের কাছে এই সুরক্ষিত স্থানটী বড়ই সুন্দর লাগিল; তাহারা এইখানেই পশ্চিম ভারতের কেন্দ্র স্থান করিয়া কুঠি স্থাপন করিলেন। এই ভাবে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের তিনটী কেন্দ্র স্থান স্থাপিত হইল। কলিকাতায় ঐ সময় হইতে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া বৃহৎ ও সুন্দর নগরী বাড়িয়া উঠিল সে সব কথা পরে জানিতে পারিবে।

মুর্শিদাবাদ—বাঙ্গালার সুবাদার ইস্লাম খাঁ

রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বাদশাহ আকবরের সময় হইতেই সুবার সুবেদার বা নাজিম ও দেওয়ান নামে দুইজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। একজন শাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেন আর একজন রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। আওরংজীব এই দুইজনের কাজের ভার বেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তবে দুইজনেরই বাদশাহের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইত।

আজি মুশ্বান যখন বাঙ্গলার সুবেদার সে সময়ে আওরংজীব তাঁহার রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রিয় মুর্শিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন, কেন না এ সময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে উপযুক্ত রাজস্ব দিল্লীতে যাইত না। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এবিষয়ে বিশেষ সু-ব্যবস্থা করিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজকার্য্যের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দেওয়ান নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। আজি মুশ্বান এই সব ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় হইতে ঢাকার অধঃপতনের সূত্রপাত। কিন্তু মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজস্ব

বিভাগের মধ্যে ঢাকা ১৩ চাক্‌লার প্রধান চাক্‌লা ছিল। ঢাকার চক্ বাজারটী মুর্শিদ কুলি খাঁ তৈয়ারী করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। মুর্শিদাবাদ আসিবার এক বৎসর পরে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ হিসাব নিকাশের কাগজ পত্র লইয়া দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরংজীবের শিবিরে গমন করিয়া রাজস্ব হিসাবে অনেক টাকা বাদশাহকে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে অনেকদিন এইরূপ প্রচুর অর্থ বাদশাহের নিকট প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং দেওয়ানের কার্য্যকুশলতায় বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে খাঁ উপাধি ও উৎকৃষ্ট খেলাৎ ইত্যাদি প্রদান করেন।

বাদশাহের নিকট হইতে এই সম্মান লাভ করিয়া আসিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ মুখসুদাবাদকে নিজের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নাম দিলেন। এবং একটা টাকশাল স্থাপন করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত মুদ্রার প্রচার আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন মুখসুদাবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন মুখসুম খাঁ নামে একজন ব্যবসায়ী। কাহারো কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ নবাব আকবর বাদশাহের সময় নির্ম্মিত। আইন-আকবরীতে মুর্শিদাবাদের নাম নাই। অকবর নামায় মুখসুম নামে একজন শাসনকর্ত্তার

নাম পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক না কেন, মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধি।

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস। সম্রাট আওরংজীবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বাদশাহ ফরক্ শায়ারের নিকট হইতে মুর্শিদকুলি খাঁ নাজিম ও দেওয়ানের পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। এ সময় হইতে নানারূপে মুর্শিদাবাদের উন্নতি হইতে আরম্ভ করে। মুর্শিদকুলিখাঁ সুবেদার হইয়া বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং ইয়োরোপীয় নানা জাতীয় লোকের ব্যবসায়ের কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। পলাসীর রণক্ষেত্রে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী, বৃহৎ ও সুন্দর নগর এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন—তাহার অধঃপতন পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই আরম্ভ হয়।

আওরংজীবের শাসন নীতি মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণ। আওরংজীব দীর্ঘ আটচল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব

আওরংজীবের শাসন-নীতি

করিয়া ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেদনগরে পরলোক গমন করেন। যে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ লইয়া তাঁহার জীবনের প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়াছিল, সেই দাক্ষিণাত্যই তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র হইল। আওরংজীব চরিত্রবান্ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি, কার্য্যকুশল জ্ঞানী, চতুর ও বিশেষ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি খাঁটী মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার কোনরূপ আমোদ প্রমোদ বা বিলাসের প্রতি মন ছিল না। আওরংজীব শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ছিলেন, নিজে দেখিয়া শুনিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এসকল গুণ থাকিলে কি হইবে, এক উদারতার অভাবেই তিনি আকবরের সুবিস্তৃত রাজ্য নাশ করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বাস বলিয়া জিনিষ তাঁহার মনে একেবারেই ছিল না। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এক যুদ্ধে দুইজন সেনাপতি পাঠাইয়া উভয়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতেন, ফলে কেহই উৎসাহ সহকারে কাজ করিত না। তিনি বৃদ্ধ পিতার প্রতি যেরূপ অন্যায়

ও কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে কমই মিলে। কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোনও জিনিষ তাঁহার মনের কোনেও স্থান পাইত না। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকেও তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। এমন কি আপনার নিজের পুত্রগণকেও বিশ্বাস করিতেন না। মীরজুমলা, জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ, প্রভৃতি সেনাপতির মৃত্যুতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যে নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন সেই পথে চলিলে মুঘল-সাম্রাজ্য আরংজীবের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস পাইত না। আকবরের উদারনীতির ফলে যেমন শত্রু ও মিত্র হইয়াছিল, তেমনি আওরংজীবের সঙ্কীর্ণতার ফলে বিশ্বাসী বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। আওরংজীব হিন্দু প্রজাদের প্রতি উদারতা দেখাইতে না পারায় হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি সুবাদারদের উপর হুকুম দিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, হিন্দু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়া তাহা-দিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। আওরংজীব ভারতবর্ষকে মুসল-মান রাজ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলেই তাঁহার জীবন বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্য দিয়াই কাটিয়া গেল।

আওরংজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইলেও তাঁহার অনুদার নীতির ফলে—তাঁহার মৃত্যুর পর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যেই রাজবংশের গৌরব লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে যে কয়জন মুঘল বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তেমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। আওরংজীবের রাজত্বের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে মহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন পারস্য দেশের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ছিলেন। ছয় ফিট লম্বা, বিকট কালো মুখ, কর্কশ স্বর আর বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল ছিল তাঁর চক্ষু দুইটী। তাঁহাকে দেখিলেই লোকে ভয় পাইত। নাদির দিল্লীর রাজপথ নররক্তস্রোতে ভাসাইয়া এবং আটান্ন দিন পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর সমুদয় ধনরত্ন মণিমুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাহ-জাহানের ময়ূর সিংহাসনখানাও পারস্যদেশে লইয়া গেলেন। নাদির শাহের এই আক্রমণে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য একরূপ লোপ পাইল। মুঘল সম্রাটেরা নামে মাত্র বাদশাহ রহিলেন। মারহাট্টারা এসময়ে প্রবল শক্তিমান, তাঁহারা মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। শিবাজীর অভ্যুদয় ইতিহাসে একটা স্মরণীয়



আপজলখাঁ　　　　নূতন ভারত, পৃঃ ১১[illegible]



ঘটনা। শিবাজীর সহিত আওরংজীবের সারা জীবনই প্রায় অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছিল। এইবার সেই কথা বলিতেছি



শিবাজী মহারাজ

পশ্চিম ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত। এ দেশের অধিবাসীরা মহারাষ্ট্রীয় নামে খ্যাত। আওরংজীব যখন ভারত-সম্রাট্, সে সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল জায়গীরদার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন শাহজী। শিবাজী এই শাহজীর পুত্র। শাহজী একজন বীর পুরুষ ছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অধীনে তিনি একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

শিবাজীর বাল্য জীবন

শিবাজী বাল্যকালে তাঁহার মাতার সহিত পুনায় থাকিতেন। দাদাজী কাহ্নদেব নামে শাহজীর একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন, তিনি শিবাজীর অভিভাবক হইলেন। বাল্যকাল হইতেই শিবাজী দাদাজীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শিবাজী কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই। অল্প বয়সেই বীর

ধনুকের ব্যবহার, অশ্বারোহণ, এসব বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ ছিল। দাদাজী রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতেন, শিবাজী তাহার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির বীরত্বের গল্প শুনিতেন ; শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাদের মত একজন বীর হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিত।

শিবাজীর বয়স যখন যোল বৎসর, তাঁহার সমবয়সী কতকগুলি যুবককে লইয়া তিনি একটী দল গঠন করিলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরিতেন এবং কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায় এসবের খোঁজ লইতেন, আর সুবিধা পাইলেই লুটপাট করিতেন। পাহাড়ের উপর দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। শিবাজীর এসময় হইতেই স্বাধীন হিন্দু রাজা হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়সে শিবাজী তোরণ দুর্গ অধিকার করিয়া সেখানকার জমিদারদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন, এবং একটীর পর একটী করিয়া কতকগুলি দুর্গ দখল করিলেন। পর বৎসর রায়গড় নামে নিজেই একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সে সময় মহারাষ্ট্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি শিবাজীর এই সকল দুর্গ বিজয়ের সংবাদ

অবগত হইয়া শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে শিবাজী এ-সকল কাজ পিতার মত লইয়াই করিতেছেন। শিবাজী পিতার উদ্ধার করিলেন। এদিকে শিবাজী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আফজল খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে পাঠাইলেন।

আফজল খাঁ অনেক সৈন্য ও কামান লইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ইনি আসিবার সময় সুলতানকে অতিশয় গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্রোহীকে অতি সহজেই শিকলে বাঁধিয়া সুলতানের পায়ের কাছে হাজির করিয়া দিবেন। শিবাজী দেখিলেন, এতগুলি সৈন্যের সম্মুখে যুদ্ধ করা অসম্ভব, তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য প্রতাপগড় দুর্গের নিকট উভয়ের সাক্ষাৎ স্থির হইল। শিবাজী ও আফজল খাঁ প্রত্যেকেই দুইজন শরীর রক্ষক বা অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রতাপ-গড়ের সন্নিকটস্থ একস্থানে সাক্ষাৎ করিলেন। শিবাজী পূর্ব্ব হইতেই অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—আফজল খাঁর অভিপ্রায় বড়

শিবাজী ও আফজল খাঁ

ভাল নহে। তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে সাক্ষাতের সময় শিবাজীকে বন্দী করিবেন, কারণ শিবাজীর মত ধূর্ত্তকে বশ করা বড় সহজ কথা নহে। কাজেই শিবাজী আত্মরক্ষার পন্থা করিয়াছিলেন। * তিনি জামার নীচে ছোট লুকাইয়া লোহার জালের বর্ম্ম এবং পাগড়ীর নীচে ছোট কড়াইয়ের মত ইস্পাতের টুপী মাথায় পরিয়াছিলেন। বাহির হইতে দেখিলে বুঝিবার যো নাই যে তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলে কড়া দিয়া লাগানো 'বাঘনখ' নামক তীক্ষ্ণ বাঁকা ইস্পাতের নখরগুলি মুঠির মধ্যে লুকানো ছিল। আর ডান হাতের আস্তিনের নীচে 'বিছুয়া' নামক সরু ছোরা ঢাকা ছিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল তলোয়ার খেলায় দক্ষ দুইজন শরীর-রক্ষক—জীব মহালা 'নামক নাপিত এবং শম্ভুজী। উভয়েই অসম সাহসী, ক্ষিপ্রহস্ত, তেজীয়ান্ পুরুষ। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুইখানা তরবারি ছিল।

যে সামিয়ানায় শিবাজীর সহিত আফ্‌জল খাঁর দেখা হইল—সেই সামিয়ানার মধ্যস্থলে যে বেদীর মত উচুস্থানে অফজল খাঁ বসিয়াছিলেন, শিবাজী তাহার উপর চড়িলেন। শিবাজী দেখিতে নিরস্ত্র, কিন্তু আফজল খাঁর কোমরে

* অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক কিন্তু বলেন যে আফজল খাঁর এরূপ কোন অসদভিপ্রায় ছিলনা।

তলোয়ার ঝুলিতেছে। আফজল খাঁ গদি হইতে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। শিবাজী ছিলেন বেঁটে ও সরু, আফ্‌জলের কাঁধ পর্য্যন্ত উঁচু, সুতরাং খাঁর বাহু দুটী শিবাজীর গলা ঘিরিল। তার পর হঠাৎ আফজল খাঁ শিবাজীর গলা নিজ বাম বাহু দিয়া দৃঢ়বেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন, এবং ডান হাত দিয়া কোমর হইতে লম্বা ছোরা খুলিয়া শিবাজীর বাম পাঁজরে ঘা মারিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্মে ঠেকিয়া ছোরা দেহে প্রবেশ করিতে পারিল না। গলার চাপ লাগিয়া শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মত হইল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে বুদ্ধিস্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফ্‌জল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া, তাঁহার পাকস্থলির পর্দ্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। খাঁর ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িল। আর, ডান হাতে বিছুয়া লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফ্‌জল খাঁর বাহু-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজে সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন। এসব ঘটনা এক নিমেষে শেষ হইল।

আফজল খাঁ চেঁচাইয়া উঠিলেন—"মারিল...মারিল... আমাকে প্রতারণা করিয়া মারিল।" অমনি অনুচরেরা ছুটিয়া আসিল। তলোয়ারের ঘায় শিবাজীর পাগড়ীর নীচের লোহার টুপাটা পর্য্যন্ত টোল খাইয়া গেল, কিন্তু মস্তক রক্ষা পাইল। ইতিমধ্যে বাহকেরা আহত আফজলকে পাল্কিতে শোয়াইয়া তাঁহার শিবিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শম্ভুজী কাব্‌জি আসিয়া তাহাদের পায়ে কোপ মারায় তাহারা পাল্কী ফেলিয়া ছুট দিল। তখন শম্ভুজী আফ্‌জল খাঁর মাথা কাটিয়া বিজয় গর্ব্বে তাহা শিবাজীর কাছে উপস্থিত করিল।

আফ্‌জল খাঁর মৃত্যু হইলে মারাহাট্টারা মুসলমান সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। বিজাপুরের সুলতান আর একদল সৈন্য পাঠাইয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই শিবাজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিবাজী এখন সুযোগ পাইয়া মুঘল রাজ্য লুটপাট করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটু সুযোগও হইল। আওরংজীব হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সে আগুন মারাহাট্টা

দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। শিবাজী এই সময়ে প্রচার করিলেন যে,—ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য তিনি এই যুদ্ধ করিতেছেন, কাজেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য দলে দলে হিন্দু আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল! সম্রাট আওরংজীব আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি এই পার্ব্বত্য মুষিককে দমন করিবার জন্য দক্ষিণ দেশের শাসন কর্ত্তা শায়েস্তা খাঁকে পাঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁ পুনঃ অধিকার করিয়া এবারে শিবাজীর বাড়ী দখল করিলেন। একদিন রাত্রিতে শিবাজী তাঁহার সৈন্য দল হইতে সাহসী পঁচিশ জন সৈন্য বাছিয়া লইয়া, এক বর যাত্রীর দলের সহিত মিশিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং অতর্কিত ভাবে শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন, জাগিয়া দেখিলেন আর রক্ষা নাই। তখন তিনি একটী জানালা দিয়া এক গাছ দড়ির সাহায্যে নীচে নামিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়নের সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করে। কিন্তু তাহা তাঁহার গায়ে না লাগিয়া—একটী মাত্র অঙ্গুলির বিলোপ সাধন করে। শায়েস্তা খাঁর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদলও পলায়ন করিল।

এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজীর মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পর শিবাজী 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। শিবাজী ইতিমধ্যে সুরাট লুঠিয়া লইলেন। আওরংজীব এই "পাহাড়িয়া ইন্দুরের" ব্যবহারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আর এক দল সেনা রাজা জয়সিংহের অধীনে পাঠাইয়া দিলেন। জয়সিংহের নাম, সৈন্য-সংখ্যা তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পরাক্রম শিবাজীর অজানা ছিল না। তাঁহার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, শিবাজী বিনাযুদ্ধেই সন্ধি করিলেন। শিবাজী মুঘলদের বত্রিশটী দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কুড়িটি নিজ দখলে রাখিয়া বাকী কয়টীর অধিকার ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে আওরংজীব শিবাজীকে দিল্লী যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। জয়সিংহের পরামর্শে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি দিল্লী গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে রাজসভায় তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত বসিতে আসন দিয়া অপমান করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই শিবাজী বুঝিতে পারিলেন যে, আওরংজীব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দীভাবে রাখিতে চাহেন। তখন তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া

শিবাজীর দিল্লী গমন

গৃহের জানালা ও দরজা দিনরাত্র বন্ধ করিয়া রহিলেন।

শিবাজীর গৃহে দিবারাত্রি চিকিৎসক আসিতেছেন ও যাইতেছেন, শিবাজী বাঁচেন কিনা সন্দেহ! কয়েকদিন পরে নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবাজী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। রোগ আরোগ্য উপলক্ষে শিবাজী ব্রাহ্মণ, সাধু ও রোগীদিগকে খুব বড় বড় ঝুড়ি ভরিয়া মিষ্টান্ন বিলি করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন এইরূপ মিষ্টান্ন বিলির পর, প্রহরীদের যখন আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় দুইটী প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের ঝুড়ি শিবাজীর বাড়ী হইতে বাহির হইল। তাহার একটীতে শিবাজী নিজে এবং অপরটীতে তাঁহার পুত্রকে বসাইয়াছিলেন; কেহ কোন সন্দেহ করিল না। এইরূপ চতুরতা করিয়া শিবাজী আওরংজীবের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া নানাস্থানে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবাজীর পলায়ন

তারপর তিনি নানা যুদ্ধে মুঘল সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বাহান্ন বৎসর বয়সে আওরংজীব বাঁচিয়া

থাকিতেই শিবাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষ ভারতবর্ষে বড় বেশী জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আপনার

শিবাজীর চরিত্র

প্রতিভাবলে তিনি একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আওরংজীবের ন্যায় ক্ষমতাশালী পরধর্ম্ম বিদ্বেষী মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে তাঁহার সহিত সমান ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া শিবাজী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী মারহাট্টা জাতির মধ্যে যে শক্তি জাগাইয়া দিয়াছিলেন সেই নবজীবনের শক্তি সহজে লোপ পায় নাই। শিবাজীর বুদ্ধি, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি, সাহস, এবং যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেও পরধর্ম্ম বিদ্বেষ তাঁহার একেবারেই ছিল না। শিবাজীর কাছে কোরাণ শারিফ ও মসজিদ তুল্য পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন সময় যদি তাঁহার হাতে কোরাণের পুঁথি পড়িত তাহা হইলে আপনি মুসলমান অনুচরকে ডাকিয়া দিতেন। তিনি স্ত্রী জাতিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। স্বদেশ, স্বজাতি, ও স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র সাধনেই তিনি তাঁহার জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজা হইয়া-

ছিলেন, কিন্তু আওরংজীব তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া বধ করিয়াছিলেন। ইহাতেও মারহাট্টারা নিরুৎসাহ হন নাই। শম্ভুজীর পরে রাজারাম এবং তাঁহার স্ত্রী তারাবাই মুঘলরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আওরংজীব শেষ বয়সে মারহাট্টাদের উৎপাতে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবিরাম পরিশ্রমে উননব্বই বৎসর বয়সে আমেদনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

শিবাজীর বংশ লোপ পাইলেও মারহাট্টা শক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ক্রমে মারহাট্টাদের আরও পাঁচটা রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মারহাট্টারা এসময়ে সারা ভারতবর্ষে লুটতরাজ করিয়া বেড়াইত এবং মুঘলরাজ্য একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছিল। বাংলার লোকেরাও তাহাদের ভয়ে কাঁপিত। এই মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরাই বর্গী নামে পরিচিত।

কয়েক বৎসরের মধ্যে মারহাট্টারা ভীষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাহারা সমস্ত ভারতের অধিপতি হইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তিনি মারহাট্টাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মারহাট্টারা যখন এমন শক্তিশালী, সেই সময়ে আফগানিস্থানের সুলতান

আহম্মদশাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের রণক্ষেত্রে মারাঠারা তাঁহাকে বাধা দিলেন বটে কিন্তু জয়ী হইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে হারিয়া মারহাট্টাজাতির আশার বাতি নিবিয়া গেল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আওরংজীব পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। মৃত্যু সময়ে তিনি কাহাকেও সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই জীবিত ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য একটী কলহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। অতঃপর নানা যুদ্ধ বিগ্রহের পর শাহজাদা মোয়াজিম বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া প্রথমেই আপনার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিমখাঁকে খান খানান উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বাহাদুর শাহ পিতামহ শাজাহানের ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও ধনাভিলাষী এবং আড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দরবার সর্ব্বদা বিবিধ সাজ সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। আমীর ওমরাহগণ সর্ব্বদা

বহুমূল্য পোষাক পরিহিত হইয়া তাহার দরবারের শোভা বৰ্দ্ধন করিতেন।

বাহাদুর শাহ অতি সঙ্কটকালে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। আওরংজীব যে সঙ্কীর্ণতা, যে অনুদারতার দ্বারা—হিন্দু জাতির মধ্যে বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, বাহাদুর শাহ ঐরূপ অনুদার নীতির পক্ষপাতী না হইলেও তৎকালে দেশের সবাই এইরূপ হইয়াছিল যে উহার প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। হিন্দুর মনের মধ্যে—বিদ্বেষের যে আগুন প্রজ্বলিত ছিল—তাহা প্রশমিত না হইয়া এ সময়ে প্রবল আকারই ধারণ করিয়াছিল। আওরংজীবের জীবিতকালেই রাজপুত ও জাঠ জাতি মুঘলের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছিল। এ সময়ে পঞ্চনদে শিখেরা দিন দিন রণ-প্রিয় দুৰ্দ্ধৰ্ষ জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। তবে বাহিরের শত্রু সকল দ্বারা বাদশাহদের যত না বিপদ হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশি বিপদ হইয়াছিল গৃহশত্রু হইতে। বিজাপুরের শাসন কৰ্ত্তা ভ্রাতা কামবক্স তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই সময়ে আওরংজীবের প্রাচীন সেনাপতি জুলফিকর খাঁ দক্ষিণাপথে ছিলেন, তাঁহার সহিত কামবক্সের

একেবারেই মনের মিল ছিল না। তিনি বাদশাহের অনুমতি না লইয়াই কামবক্সকে আক্রমণ করিলেন। মুনিমখাঁ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। জুল তাহাকে বন্দী করিয়া রাজশিবিরে লইয়া গেলেন। তাঁহার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত হইল। কিন্তু অভিমানী কামবক্স কোনরূপ চিকিৎসা ও যত্নের জন্য ব্যস্ত হইলেন না। বাহাদুরশাহ নিজে সন্ধ্যার সময় ভ্রাতার নিকট আসিলেন, নিজ হস্তে সুরুয়া পান করাইলেন এবং চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কামবক্স বাঁচিলেন না, সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

জুলফিক্‌রখাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি মহারাষ্ট্র জাতিকে মুঘল বাদশাহের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে এক করিবার জন্য যত্নবান ছিলেন। এই সময়ে নানাদিক দিয়াই দেশের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে মুঘল বিদ্বেষ নানারূপে প্রকাশিত হইয়া শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল এবং শিখজাতি পঞ্চনদ প্রদেশে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে বিদ্রোহ আচরণ করিতেছিল।

বাহাদুরশাহ দেখিলেন এক সঙ্গে রাজপুত ও শিখজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে তাহার পক্ষে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এইজন্য তিনি অম্বর যোধপুর প্রভৃতি রাজপুত নৃপতিদের সহিত সন্ধি ও সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজপুতদের সহিত বন্ধুত্ব হইবার পরে বাহাদুরশাহ নবজাগরিত শিখশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি মুনিনখাঁর অধীনে এক প্রবল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে শিখদের ভীষণভাবে পরাজয় হইল। মুনিনখাঁ বিজয়ী মুঘল সৈন্যবাহিনী লইয়া সগৌরবে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মুনিনখাঁর মৃত্যু হইল।

এই সময়ে সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গোলযোগ চলিতেছিল। সুন্নী সম্প্রদায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই বাদশাহ উভয়পক্ষের কলহ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং একটা ধ্বংসকারী অশান্তির কারণ না ঘটে, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছিলেন। কেননা, মারাঠা, রাজপুত, শিখ সকলেই মুঘল রাজশক্তি যাহাতে ধ্বংস পায় সেইজন্য উদগ্রীব ছিলেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল না। এই সময়ে

হঠাৎ বাহাদুরশাহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ফলে চারিদিক হইতে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য একটা ব্যগ্র আয়োজন পড়িয়া গেল। রাজপুরুষেরা নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা অরাজকতা এবং অনিয়ম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঠিক এইরূপ অশান্তির সময়ে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খানি খাঁ বাহাদুর শাহের চরিত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

For generosity, munificence, boundless good nature, extenuation of faults, and forgiveness of offences very few monarchs have been found equal to Bahadur Shah in the histories of the past times, and specially in the race of Timur. But though he had no voice in his character, such complacency and such negligence were exhibited in the protection of the state and in the government and the management of the country, that worthy Sarcastec people found the date of his accession in the words Shah-i-he Khabr, "Heedless King."

জাহন্দর শাহ

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জাহন্দর শাহ সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সিংহাসন লাভে দক্ষিণাপথের সুবেদার জুলফিকর খাঁ বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট সিংহাসন লাভ করিয়াই ভ্রাতাদের ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিলেন। জুলফিকর খাঁ হইলেন বাদশাহের মন্ত্রী। দক্ষিণাপথের শাসন কার্য্য দাউদ খাঁ নামক একজন প্রতিনিধির হস্তে সমর্পিত হইল।

জাহন্দর শাহ অযোগ্য, বিলাস-পটু, অলস এবং রাজকার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। লালকুয়র নামে একটি কুলটা রমণী বাদশাহের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাকে বাদশাহ বার্ষিক দুই কোটি টাকা বৃত্তি দিতেন এবং তাহার প্রয়োজনীয় বিলাসের উপকরণ, মণিমুক্তার মূল্য এবং বসনভূষণের ব্যয়ও রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ছিলনা, বিচার বিবেচনা ছিলনা, জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর ছিলনা। ছিল শুধু বিলাস, ভোগ ও ব্যাভিচারের পূর্ণমাত্রায় প্রভাব। দিবারাত্র নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কনে সেতার ও এস্রাজের সুমধুর গুঞ্জনে

রাজদরবার মুখরিত থাকিত। এইরূপ রাজত্ব শীঘ্রই শেষ হইতে বাধ্য। এই সময়ে আজিমউখাশ্বানের পুত্র ফররুখ্‌শিয়র বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ফররুখ্‌শিয়র বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়া রাজধানী অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং পথে বিহারে তাহার পিতার বন্ধু ও কর্ম্মচারী হোসেন আলিখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলিখাঁ তাহার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ফররুখ্‌শিয়রের সহিত যোগদান করিলেন। এলাহাবাদের কাছে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। জুলফিকর খাঁ সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহেরা জাহন্দর শাহার অত্যাচার ও অনাচারে এতদূর অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাহারা কেহই প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিলেন না। চারিদিক হইতে অশ্রান্ত ভাবে বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। জাহন্দর যে হস্তীতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই হস্তীও ক্ষেপিয়া উঠিল। তিনি কাপুরুষের মত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই লালকুয়রকে লইয়া পলায়ন করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী জুলফিকর ভবিষ্যত সম্রাটের কৃপালাভের প্রত্যাশায় জাহন্দরশাহকে বন্দী করিলেন।

ফররুখ্‌শিয়র

এইবার ফররুখ্‌শিয়র সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার আদেশে জাহন্দর শাহ, জুলফিকর খাঁ ও তাঁহার পিতা আসদ খাঁ অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। আওরংজীবের হিন্দু-বিদ্বেষ বাহাদুর-শাহর রাজ্যশাসনের অযোগ্যতা, জাহন্দর শাহর চরিত্রহীনতা ও বিলাস মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। ফররুখ্‌শিয়র অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন। নিজে বিচার করিয়া কোন কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কাজেই সৈয়দ ভ্রাতারা—আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেনআলী খাঁ যাহা বলিতেন, তাহাই হইত। ফলে রাজ্যশাসনের সমুদয় ক্ষমতা সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে শিখজাতির পুনরায় প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা লাহোর হইতে আম্বালা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল। বাদশাহ শিখদিগকে দমন করিবার জন্য এক বিপুল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিখেরা নিজেদের মান মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। মুঘল সৈন্যেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ

তাহাদের শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটায় তাহারা মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। মুঘল সেনাপতি এই সময়ে যে, নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। তিনি দুই হাজার শিখের শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক ছিন্নমস্তকগুলি বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু বান্দা তাঁহার প্রায় এক সহস্র অনুচর সহ হস্ত-পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধরূপে রাজধানীতে প্রেরিত হইলে বন্দী শিখবীরগণ একে একে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বান্দার উপর নিজহস্তে আপনার শিশুপুত্রকে বধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। বান্দা ধীর গম্ভীরভাবে অবিচলিত চিত্তে সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন এবং পরে অতি নৃশংসভাবে তাঁহার হত্যাকার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ফররুখশিয়রকে সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত করেন। এই সময়ে সৈয়দ ভ্রাতাদের ক্ষমতা অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা যাহাকে ইচ্ছা বাদশাহ করিতেন। এই ভাবে এক বৎসরের মধ্যে তাহারা পর পর তিন জনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাদশাহদের মধ্যে মহম্মদ শাহ ১৭১৯—১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে

পারিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ সৈয়দ হোসেন আলীখাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং সৈয়দ আবদুল্লাকে বন্দী করিয়াছিলেন। মহম্মদশাহের সময়ে মুঘল সামাজ্যের ধ্বংস হয়। মহম্মদ সাঁহের মন্ত্রী ছিলেন আসফ জাহ। আসফ জাহ আওরংজীবের আমলেই একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার চিন্‌কিলিচ এবং নিজামউল্ মুলক এই দুইটী উপাধি ছিল। তিনি মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য মনোযোগী হইলেন বটে, কিন্তু প্রতিপদে অন্যায়ভাবে বাদশাহের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজবংশ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজামের ন্যায় অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ আলী খাঁ, বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁ, জাঠগণ, আফগান জাতীয় রোহিলাগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে চারিদিকে ভীষণ অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট্ নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কর্ণালের নিকট মুঘল সৈন্য তাহার নিকট পরাজিত হইল। প্রায় বিশ হাজার মুঘল সৈন্যের

এই যুদ্ধে প্রাণনাশ হইয়াছিল। মহম্মদ শাহ নাদির শাহের শিবিরে যাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সহিত রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন। অকস্মাৎ নগর-মধ্যে নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় দিল্লীর অধিবাসিগণ পারসিক সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে নাদিরশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মানুষ কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। নাদির দিল্লীর রাজপথ নর-রক্তস্রোতে ভাসাইয়া এবং আটান্ন দিন পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর সমুদায় ধনরত্ন, মণিমুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন খানাও পারস্য দেশে লইয়া গেলেন। নাদির শাহের এই আক্রমণে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য একরূপ লোপ পাইল। মুঘল সম্রাটেরা নামে মাত্র বাদশাহ রহিলেন। মারাঠারা এই সময়ে প্রবল শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল— তাহারা মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে চৌথ পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইতেন।

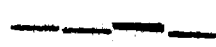
নাদিরশাহের আক্রমণে মুঘল রাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। ইহার পরে দিল্লীর বাহিরে দিল্লীর বাদশাহদের আর সেইরূপ ক্ষমতা ছিল না। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আহম্মদ শাহ বাদশাহ হইলেন। ইহার কিছু

পূর্ব্বে আহম্মদ-শাহ দুরাণী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আহমদশাহ নাদির শাহের অধীনে আফগানিস্থানে শাসন কর্ত্তা ছিলেন। নাদিরশাহের মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ১৭৫৬—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদশাহ দুরাণী ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী লুণ্ঠন এবং মথুরায় সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করেন।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহমদশাহ তাহার হস্তচ্যুত পঞ্জাব পুনরায় অধিকার করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা তাহাদের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য এক বিপুল সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। মারাঠা দলের সেনাপতি হইলেন পেশোয়ার সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাও। বিশ্বাস রাও সাহসী ছিলেন, কিন্তু সেনাপতি হইবার যোগ্যতা তাহার ছিল না। মারাঠারা দিল্লী অধিকার করিয়া পাণিপথে আহমদ শাহ দুরাণীর সম্মুখীন হইলেন, উভয় পক্ষ শিবিরের চারিদিকে পরিখা কাটিয়া প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজাদ্দৌলা আহমেদশাহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ভোরবেলা মারাঠারা সমস্ত সৈন্য লইয়া আহমদ শাহ দুরাণীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম অতি ভয়াবহ হইল। মারাঠাদের অতি নিদারুণ পরাজয় ঘটিল। তাহাদের উত্তর ভারত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গেল। এই যুদ্ধে মারাঠাপক্ষের প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং সদাশিব রাও, বিশ্বাস রাও প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি-গণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণিপথের এই যুদ্ধে হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয়ের আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, আর মুঘল সাম্রাজ্য লোপ পাইল।



মুঘল রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অবস্থা

বাবর যেদিন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন সে দিন হইতে ইংরাজের প্রতিষ্ঠার সময় পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল মুঘল সম্রাটেরা ভারতবর্ষের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে তাহাদের সংশ্রবে আসিয়া হিন্দুরা

আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছদে, ভাষায় প্রত্যেক বিষয়েই বিজেতা মুসলমানদের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুসলমানেরাও সেইভাবে হিন্দু প্রতিবেশীর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দুই জাতিই পরস্পরে ক্রমশঃ মিলনের পথে আসিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট্ আকবরের উদার নীতি, শাসন প্রণালী ও সহৃদয়তা উভয় জাতির মিলনের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আওরংজীবের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মান্ধতা, আকবরের ভবিষ্যত দৃষ্টি ও পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আওরংজীব হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই ফলে উভয় জাতির মিলনের আশা লোপ পাইয়াছিল।

সামাজিক মিলন

মুঘলের দেশশাসনের ব্যবস্থা

পাঠান বীর শেরশাহ ও মুঘল সম্রাট্ আকবর দেশের শাসন শৃঙ্খলার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবাপ্রদেশ একজন সুবাদারের অধীনে থাকিত, তাঁহার অধীনে আবার অনেক রাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে দেওয়ানই ছিলেন

প্রধান। দেওয়ান রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন, আর সুবাদার ফৌজদারী বিচার, যুদ্ধের ব্যবস্থা, সৈন্যের বা ফৌজের তত্ত্বাবধান করিতেন। বাদশাহের অধীনতা মানিয়া নিয়মিতভাবে রাজকর দিয়া আসিলেও সুবাদার একরূপ স্বাধীন ভাবেই সুবা শাসন করিতেন। বাদশাহ কোনরূপ বাধা দিতেন না। সুবাদারের পদও বংশানুক্রমিক ভাবে চলিত।

হিন্দু ও মুসলমান রাজপুরুষ—মুঘল রাজত্ব-কালে কি দেওয়ানি, কি ফৌজদারী প্রত্যেক বিভাগেই হিন্দুরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দুদের শাসন-নৈপুণ্য মুঘল সম্রাটেরা বিশেষ ভাবে মানিতেন। আকবর, টোডরমল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দু সুবাদার, সেনানায়ক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু বিদ্বেষী আওরংজীবও হিন্দু সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটেরা দরিদ্র ও অসমর্থ ব্যক্তির সাহায্যের জন্য ভূমি দান করিতেন। যোগ্য রাজ-কর্ম্মচারী এবং বেশীর ভাগ তাঁহাদের সেনাপতিরা জায়গীর লাভ করিতেন। জায়গীরের মালিকদের বংশধরেরা পর্য্যন্ত সে সমুদয় জায়গীরের মালিক হইত, ইহার ফলে সরকারের খাস জমি হ্রাস পাইতেছিল

দেখিতে পাইয়া আকবর এই ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া ঐরূপ কর্ম্মচারীদের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু পরে অনেক মুঘল সম্রাট এই নিয়ম তুলিয়া দিয়া পুনরায় জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই জায়গীরদারদের ন্যায় ভূমির উপস্বত্ব ভোগী আর এক শ্রেণীর লোক জমিদার বলিয়া কথিত হইতেন। ইহাদের বৎসর বৎসর রাজসরকারে রাজস্ব জমা দিতে হইত। জমিদারেরা বাদশাহের দরবারে কেবল মাত্র রাজস্ব দিয়া মুক্ত থাকিতেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য মামলা মোকদ্দমার বিচার করিতেন এবং সময় সময় নিজেরা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

জায়গীর ও জমিদার

মুসলমান আমলের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

—মুসলমানদের কাছে ভারতবাসী ইতিহাসের জন্য ঋণী। হিন্দুরা কোনদিন ইতিহাস লিখিতেন না, কিন্তু মুসলমানেরা এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, কয়েকখানা ইতিহাস মুঘল বাদশাহেরাও

লিখিয়াছিলেন। ফিরিস্তা, আবুলফজল, কাফি খাঁ এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মীন্হাজ্উদ্দিন, সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারণি প্রভৃতি প্রধান ঐতিহাসিকগণের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া আছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আক্বরী, এবং আকবর-নামা এ দুইখানি গ্রন্থে আকবরের সময়ের ইতিহাস বিশদ ভাবে লিখিত আছে। কাফি খাঁ আওরংজীবের আমলের লোক। আওরংজীব ইতিহাস লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া কাফি খাঁ বা গুপ্ত লেখক এই নামে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ হাসিম। সম্রাট্ বাবর ও জাহাঙ্গীর আপনাদের জীবন চরিত্ত লিখিয়া গিয়াছেন। আর একজন বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিকের নাম গোলাম হোসেন খাঁ; ইনি মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সময় হইতে ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের নাম মুতাক্ষরীণ।

ভারতবর্ষের সাহিত্য

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের সেই আন্দোলনে দেশী ভাষার উন্নতি হইয়াছিল। মুঘল আমলেও এই প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুঘল শাসনকালেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ

মুকুন্দরামের চণ্ডী, কাশীরাম দাসের মহাভারত, রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং বহু বৈষ্ণব কবির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তুকারামের রচনা মহারাষ্ট্রীয় ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু কবি তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন।

স্থাপত্য-শিল্প, চিত্র-শিল্প ও সঙ্গীত ইত্যাদি

মুসলমানেরা এদেশে আসার ফলে ভারতবর্ষের বিবিধ ললিতকলা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মুঘলেরা স্থপতি-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মুঘল বাদশাহদের নির্ম্মিত দুর্গ, প্রাসাদ, তোরণ, সমাধি প্রভৃতি আজিও পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। আগ্রার লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ, সেকেন্দ্রার মনোহর উদ্যান-মধ্যস্থিত আকবরের সমাধি, ফতেপুর সিক্রীর মিনার ও বিভিন্ন মহাল, ইতিমাদ্‌উদ্দৌলার সমাধিমন্দির, শাহজাহানের নির্ম্মিত অতুলনীয় মর্ম্মর পাথরের তাজমহল, দুর্গ, মতিমসজিদ ও শত শত সমাধি হর্ম্ম্য এখনও মুঘল স্থপতিদের অসাধারণ শিল্পকৌশল প্রকাশ করিতেছে। মুঘলদের সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যায়ও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তানসেনের ন্যায়

সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি আকবরের দরবারের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। মুঘল চিত্রাঙ্কন-নীতি একটী শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

ব্যবসায় বাণিজ্য

ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জাতি মুঘলদের শাসনকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন এবং অনেক স্থলে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুঘল রাজত্বের শেষ অবস্থায় স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীদের অর্থ-লোভের দরুণ সে সময় লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না, এই জন্য সেই সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ

মুঘল রাজত্বকালে কয়েকজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসেন। হকিন্স ও স্যার টমাস রোর বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হকিন্স জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি এবং রো মুঘল দরবারের এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের চরিত্রের এক অতি সুন্দর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ অবস্থায়

যখন সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ ও অশান্তি চলিতেছিল, সেই সময়ে— ফরাসীদেশীয় পর্য্যটক বর্ণিয়ার এদেশে আসেন। বর্ণিয়ার এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধন সম্পদ এবং মুঘল দরবারের ঐশ্বর্য্য ও জাঁক জমকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণের উপর বড় অত্যাচার করিত। আওরংজীবের রাজত্ব কালে মেনুচী নামক ইটালী দেশের একজন ভ্রমণ কারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একখানা খুব বড় বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সে সময়ে দরবারে পারস্য ভাষার ব্যবহার ছিল, তবে সাধারণে উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন করিত।

মুঘল রাজত্বে বাঙ্গলাদেশ একরূপ স্বাধীন ছিল। মুঘলদের রাজত্বকালে যে সকল শাসনকর্ত্তা বাঙ্গলাদেশ শাসন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দাউদখাঁ মুঘলদের অধীনতা পছন্দ করেন নাই। তিনি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া অবশেষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেকালে দিল্লী হইতে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। এই সকল শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে শাহজাহানের দ্বিতীয়

পুত্র শাহসুজা, শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। কি পাঠানদের সময় কি মুঘলদের সময় বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা স্বাধীন রাজাদের মত থাকিতেন। সেকালে তাঁহাদের প্রধান বারো জনকে বারো ভূঁইয়া বলিত। ঈশাখাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুঘলদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। মোটের উপর সমগ্র বাঙ্গলাদেশই মুঘলদের অধীন হইয়াছিল।

বাঙ্গলাদেশের সুবাদারগণের মধ্যে মুর্শিদকুলিখাঁ ও আলিবর্দ্দীখাঁ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে রাজধানী মুকসুদাবাদে লইয়া আসেন এবং নিজের নামানুসারে উহার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

মুঘল রাজত্ব সময়ে আলিবর্দ্দীখাঁ যখন বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা তখন মারহাটা বর্গীদস্যুরা বাঙ্গালাদেশে নানারূপ অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিয়াছিল। আলিবর্দ্দীখাঁ কোনরূপেই তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধি করিবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ শিবিরে আনয়ন করিয়া হত্যা করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের এই শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরবৎসর বর্গী'রা বহু

লোকজন লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল, আলিবর্দ্দী নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন। বাঙ্গালাদেশে বর্গী'র অত্যাচারের ন্যায় অত্যাচার কোন দিনই হয় নাই। এখনও দুরন্ত শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার সময় জননী গাহিয়া থাকেন,—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

এই সময়ে ইউরোপের নানাজাতি বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজেরা মেঘনার মোহনায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা এবং আরাকানের মগেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক অত্যাচার করিত। এই মগেদের ও ফিরিঙ্গিদের দমন করিবার জন্য মুঘল শাসনকর্ত্তারাও ইদ্রাকপুর সোনাকান্দা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাদের দমন করিবার জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

মুঘল রাজত্বকালে ভারতবাসীর সাধারণ অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল এবং তাহারা অতি অল্পব্যয়ে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিত। আকবরের রাজত্ব কালে খাদ্যসামগ্রীর

মণকরা কিরূপ দর ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াই আমাদের গ্রন্থ শেষ করিলাম।

		গমের ময়দা (নিকৃষ্ট)	।৵০
গম	॥/৫	মুক্তোর দাইল	।৶৫
যব	৶/।	ঘৃত	২।৵০
ভূট্টা	॥/১০	তৈল	২৲
সুবি চাউল	॥০	গুড়	১।৵৫
জিরা (সরু)			
চাউল	১৲	হরিদ্রা	।০
দুগ্ধ	॥৶	কাপড়	
		প্রতি গজ	/০
পেঁয়াজ	॥/০	কম্বল (নিকৃষ্ট)	।০
মটরের দাল।	।/০		

সে যুগে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ।৵০ আনা ব্যয়ে বিনাক্লেশে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিত। মাসিক ১৷৵০ ব্যয়ে পাঁচ-ছয় জন লোক লইয়া, অনায়াসে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত।

এই সব নানা কারণে মুঘল ভারতে জনসাধারণ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়াই জীবন অতিবাহিত করিত।

সম্পূর্ণ